৭.০১ দস্যু জাভেদ – Bangla Library

৭.০১ দস্যু জাভেদ – Bangla Library

দস্যু জাভেদ – ১০১

অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে দাঁড়ালো জাভেদ।

আশা ওর অশ্বের লাগাম চেপে ধরে বললো–জাভেদ, তোমার বাপুর ইচ্ছা নয় তুমি তার মত হও।

আশার কথা শুনে হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলো জাভেদ– ঠিক বনহুরের মতই তার হাসিটা।

অবাক দৃষ্টি নিয়ে আশা তাকিয়ে রইলো জাভেদের মুখের দিকে। বনহুরের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাচ্ছে আশা তার মধ্যে। সেই মুখচ্ছবি যেন স্পষ্ট হয়ে ফুটে

উঠেছে-সেই প্রশস্ত ললাট, ঝাঁকড়া চুল, দীপ্ত উজ্জ্বল চোখ দুটি…

জাভেদ হাসি থামিয়ে বললো–বাপুর রক্ত আছে আমার ধমনিতে, কাজেই বাপুর ইচ্ছা না থাকলেও আমি ঠিক তার মতই হবো। হাজার নিষেধ বা বাধা-বিপত্তি আমাকে ক্ষান্ত করতে পারবে না। একটু থেমে বললো জাভেদ–আশা আম্মু, তুমি যতই আমাকে সাধুবাক্য শোনাও আমি তা মানতে রাজি নই।

জাভেদ।

বলো?

আমি তোমার বাপুকে কথা দিয়েছি জাভেদকে আমি মানুষের মত মানুষ করবো কিন্তু তুমি…

আমি কি মানুষের মত মানুষ নই আশা আম্মু?

জাভেদ, তোমাকে আমি বারবার বলেছি দস্যুতা তুমি করতে পারবে না।

কিন্তু আমি তো অন্যায়ভাবে কিছু করিনি? আজ যা দেখছো তা এক স্মাগলার দস্যুর। দস্যুকে দমন করা অসংগত কাজ নয়। স্মাগলার গাঙ্গুলাল মাইথী গোপনে কোটি টাকার মূল্যবান পাথর আপেলের মধ্যে ভরে দেশের বাইরে চালান করছিলো। আমি তা হতে দেইনি এই যা। কথা শেষ করে পিঠে ঝোলানো ব্যাগটা নিচে নামিয়ে রেখে বললো–আশা আম্মু, শুধু আপেলগুলোই আনিনি, তার সঙ্গে এনেছি…এই দেখো! একটি রক্তমাখা দ্বিখন্ডিত মাথা ব্যাগ থেকে বের করে তুলে ধরলো আশার সম্মুখে।

আশা দুহাতে মুখ ঢেকে ফেললো।

জাভেদ অট্টহাসি হেসে উঠলো।

আশা চোখ থেকে ধীরে ধীরে হাত সরিয়ে নিয়ে অধর দংশন করে বললো–জাভেদ, এই তোমার কাজ!

হাঁ।

জাভেদ।

আমি বাপুর চেয়েও দুর্ধর্ষ হবো তুমি দেখে নিও....

জাভেদ, তুমি এতো ভয়ংকর হবে তা ভাবতে পারিনি। তোমার কাজে আমি দুঃখিত....

জাভেদ হেসে বললো–আশা আম্মু, আমিও কম দুঃখিত নই তুমি যদি আমার কাজে বাধা দাও। কথাটা বলে গাঙ্গুলাল মাইথীর মাথাটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো দূরে। তারপর বললো-বাপু, আমার কাজে সন্তুষ্ট হবে না জেনে আমি সরে এসেছি তোমার পাশে। তুমি যদি বাধা দাও তাহলে আমি

জাভেদ, আমি তোমার কোনো কথা শুনতে চাই না। তুমি বলো আমার কথা মানবে কিনা?

আমি তোমার সবকথা মানবো কিন্তু আমার কাজে তুমি বাধা দিও না আম্মু ।

আশা ছুটে চলে যায় কুটিরের মধ্যে। বিছানায় উবু হয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। বনহুরকে কথা দিয়েছিলো জাভেদকে আশা অন্যরকম করে গড়ে তুলবে। সে হবে একজন স্বাভাবিক সাধারণ মানুষ কিন্তু তার সে কথা রইলো না। কি করে মুখ দেখাবে সে বনহুরকে। অসুস্থ বনহুরকে সে রেখে এসেছে কান্দাই আস্তানায়। কত আশা ভরসা তার বুকে। নূর যেমন লেখাপড়া শিখে একজন শ্রেষ্ঠ ডিটেকটিভ হয়েছে তেমনি জাভেদও হবে একজন শিক্ষিত নাগরিক। কিন্তু জাভেদ লেখাপড়া তেমন করলো না। বনহুর দস্যু হলেও সে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত; সবরকম প্রকৌশলী বিদ্যা রয়েছে তার মধ্যে। কেউ কোনদিন তাকে শিক্ষার দিক দিয়ে পরাজিত করতে পারেনি। আর তারই সন্তান জাভেদ কিনা অমানুষ।–

জাভেদ দরজায় দাঁড়িয়ে বলে-আশা আম্মু, আপেলগুলো ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিতে গেলাম।

আশা চোখ তুলবার পূর্বেই কুটির হতে বেরিয়ে গেছে জাভেদ।

দরজায় এসে দাঁড়ালো আশা। জাভেদ তখন অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসেছে।

আশার গন্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রুধারা।

জাভেদ তার অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসতেই অশ্বটি সম্মুখের দুপা তুলে চিহি চিহি শব্দ করে উঠলো, তারপর ঝড়ের বেগে উধাও হলো।

অশ্বপদশব্দ ভেসে আসছে আশার কানে।

জাভেদ আজ পূর্বের সেই শিশুটি নেই; সে অনেক বড় হয়েছে। বুঝতে শিখেছে সে। বাপুর ইচ্ছা সে জানে তবু সে নিজেকে সংযত করতে পারবে না।

বনহুর একদিন বলেছিলো তার ছেলে তারই মত হবে, কারণ তার দেহের রক্ত আছে। জাভেদের দেহে কিন্তু বুঝেও সে না বোঝার ভান করেছে জেনেও না জানার অভিনয় করেছে। জাভেদকে বনহুর তার মত না হবার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছে। প্রচেষ্টা তার সফল হবে না, এটাও জানতো বনহুর তবু সে আশার কাছে অনুরোধ জানিয়েছিলো যেন ওকে সে মানুষের মত মানুষ করে গড়ে তোলে।

আশা ফিরে আসে বিছানায়।

একটা অশান্তির ছায়া ঘনীভূত হয়ে পড়ে তার মানে, বড় হয়ে জাভেদ নিজমূর্তি ধারণ করেছে। ওকে আর কেউ রুখতে পারবে না।

অনেক ভেবেও যখন আশা কোনো স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারলো না তখন শয্যা ত্যাগ করে ফিরে এলো তার অশ্বপাশে। কোথায় গেলো জাভেদ দেখবে সে।

আশা অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসলো, তারপর উল্কাবেগে অশ্ব নিয়ে অগ্রসর হলো যে পথে জাভেদ গিয়েছে সেই পথে।

জাভেদের অশ্বপদ শব্দ অস্পষ্টভাবে শোনা যাচ্ছিলো। আশা সেই শব্দ লক্ষ্য করে নিজ অশ্বকে চালনা করলো।

জাভেদ সবার অগোচরে হীরা পর্বতের গোপন এক স্থানে আস্তানা গড়ে তুলেছিলো। সেখানে সে একা, কেউ তার সঙ্গী বা অনুচর ছিলো না। তার নিজ আস্তানার এক অধিনায়ক সে।

জাভেদ বুঝতে পেরেছিলো আশা তাকে অনুসরণ করবে এবং তার কাজে বাধা দেবে, তাই আশার দৃষ্টি এড়িয়ে নানা পথে সে এক সময় তার সেই গোপন গুহায়

এসে পৌঁছলো।

আশা তার পেছনে ধাওয়া করেও তাকে ধরতে পারলো না।

জাভেদ ততক্ষণে তার গোপন গুহায় পৌঁছে গেছে। অশ্বটিকে একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বেঁধে জাভেদ প্রবেশ করলো তার গুহায়।

নির্জন গুহা।

ছোট্ট বা ক্ষুদ্র নয়-বিরাট গুহা।

গুহাটা পর্বতমালার মাঝামাঝি একটি পর্বতের আড়ালে অথচ পৃথিবীর আলো-বাতাস প্রবেশে বাধা নেই। গুহাটা জাভেদের ভারী পছন্দ।

এ গুহাটার সন্ধান কেউ কোনোদিন পাবে না। অত্যন্ত গোপন স্থানে সংরক্ষিত এক সৈন্যশিবির যেন জাভেদ তার অশ্বটিকে অদূরে এক গাছের গোড়ায় বেঁধে গুহায় প্রবেশ করলো।

পিঠ থেকে আপেলের বোঝাটা খুলে নিয়ে নামিয়ে রাখলো গুহার মেঝেতে, তারপর বসলো সে একটা পাথরাসনে। ঝুঁকে পড়ে একটা আপেল তুলে নিলো হাতে, তারপর আপেলটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে আপন মনে হেসে উঠলো-হাঃ হাঃ হাঃ কি সুন্দর আপেলটা। এমনি সবগুলো আপেল কিন্তু তার ভিতরে যা আছে তা আরও সুন্দর এবং মূল্যবান।

জাভেদ প্যান্টের পকেট থেকে একটা ছুরি বের করে একটা আপেল কেটে ফেললো। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়লো একটি উজ্জ্বল দীপ্ত পাথর। মূল্যবান হীরকখটি হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলো জাভেদ। চোখ দুটো তার জ্বলছে যেন।

একটি একটি করে সবগুলো আপেল কেটে বের করলো হীরাগুলো তারপর রুমালে মুছে পরিষ্কার করে নিলো। সাজিয়ে রাখলো সম্মুখস্থ একটা পাথরের উপর।

অন্ধকার গুহাটার মধ্যে উজ্জ্বল হীরাগুলো ঝকমক করতে লাগলো। আনন্দে জাভেদের চোখ, দুটো জ্বলজ্বল করে উঠলো। জীবনে এই তার প্রথম জয়লাভ।

মূল্যবান হীরাগুলো পাচার করে দেওয়া হচ্ছিলো দেশের বাইরে। স্মাগলার দলকে জাভেদ পাকড়াও করেছে এবং তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা বানচাল করে দিয়েছে যার জন্য ওরা হারিয়েছে ওদের মূল্যবান সম্পদ হীরাগুলো।

আশা তার অশ্ব নিয়ে বহু সন্ধান করেও পেলো না জাভেদকে। সুচতুরা আশার চোখে সে ধুলো দিয়ে গোপন স্থান বেছে নিয়েছে তার আস্তানার জন্য।

ফিরে আসে আশা বিফল মনোরথ হয়ে।

মন তার বিষণ্ণতায় ভরে উঠেছে।

অনেক আশা-ভরসা ছিলো তার জাভেদের উপর। জাভেদকে সে নিজের মনের মত করে গড়ে তুলবে কিন্তু সে তার সব আশা-বাসনা পূর্ণ করে দিলো। জাভেদ নরহত্যা করতেও পিছপা হয়নি। বনহুরকে আশা কথা দিয়েছিলো জাভেদকে সে মানুষের মত মানুষ করে গড়ে তুলবে। আশা তার ছোট্ট কুটিরের মঝেতে পায়চারী করতে থাকে। তার ভারী বুটের শব্দের প্রতিধ্বনি হতে থাকে নিস্তব্ধ কুটিরের মাঝে।

*

চমকে উঠলো মনিরা।

মেঝেতে ভারী বুটের শব্দ কানে ভেসে এলো তার। এ শব্দ তার অতি পরিচিত, আনন্দে দুলে উঠলো মনিরার হৃদয়। সে ছাড়া কেউ নয়, মনিরা অন্ধকারে চোখ মেলে তাকালো।

ভারী বুটের শব্দ তার বিছানার দিকে এগিয়ে আসছে।

বুকটা টিপ টিপ করছে মনিরার।

তবে কি সত্যি সে এসেছে?

বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালো কেউ।

মনিরার নিঃশ্বাস যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে প্রবল উদ্দীপনা নিয়ে প্রতীক্ষা করছে একজনের। যাকে সে কামনা করে এসেছে দিনের পর দিন-তার স্বামী।

বিছানার পাশে বসে পড়লো কেউ, তারপর একটি শান্ত চাপা কণ্ঠস্বর মনিরা।

মনিরা নিশ্চুপ, কোনো জবাব সে দিলো না।

এ কণ্ঠস্বর সে বহুদিন শোনেনি, আজ তার মন উচ্ছল আনন্দে নেচে উঠলো যেন।

আবার সেই কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি-মনিরা, আমি এসেছি…মনিরা, কত ঘুমাও?

এবার মনিরা নিশ্চুপ থাকতে পারলো না, বললো-তুমি এত নিষ্ঠুর।

এ তো পুরানো কথা মনিরা, নতুন কথা কিছু বলো? বনহুর মনিরার হাতখানা মুঠোয় চেপে ধরে বললো।

মনিরা ততক্ষণে শয্যায় উঠে বসেছে।

তার মুখমন্ডল অভিমানে রাঙা হলেও অন্ধকারে দেখা যাচ্ছিলো না। তবু বনহুর অনুভব করছিলো মনিরা তার উপর ক্ষুণ্ন হয়েছে। আর নিজকে সে এ কারণে অপরাধী মনে করছিলো।

বললো মনিরা-নতুন কথা শুনতে চাও?

হাঁ বলল, তই বলো মনিরা নতুন কিছু শুনতে চাই তোমার মুখে।

শোন তাহলে-তোমার পুত্র এখন আর ছোট্টটি নেই।

জানি মনিরা সে এখন শুধু বয়সে বড় হয়নি, সে এখন কান্দাইয়ের প্রখ্যাত ডিটেকটিভ

শুধু তাই নয়, সে দস্যু বনহুরকে গ্রেফতারের জন্য উদগ্রীব এবং আমার যতদূর মনে হয় সে সফল হবে।

মনিরা তুমি…

হাঁ আমি আর তার সঙ্গে লুকোচুরি করতে পারবো না। কারণ সে এখন আমার চেয়ে অনেক বেশি জ্ঞানী বুদ্ধিমান হয়েছে। কথা বলতে গেলেই ভয় হয় কখন

বুঝি ওর কাছে আমার দুর্বলতা ধরা পড়ে যায়। জানো সে সর্বক্ষণ দস্যু বনহুরকে খুঁজে ফিরছে।

জানি

আর কতদিন এমনি চোরের মত পালিয়ে পালিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবে?

মনিরা, বার বার তুমি আমাকে এ কথা বলে দুঃখ দাও! তুমি তো সব জানো, নতুন করে বলবার কিছু নেই। কথাটা শেষ করেই বনহুর মনিরাকে টেনে নেয় কাছে, গভীর আবেগে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে বলে-মনিরা, চোরের মত পালিয়ে আসি তবু তুমি আমাকে কোনোদিন অবহেলা করে ফিরিয়ে দাওনি….

মনিরা স্বামীর বাহুবন্ধন থেকে নিজকে মুক্ত করে নিতে পারে না। বরং সে আবেগে স্বামীর বুকে মুখ গুঁজে চোখ দুটো বন্ধ করে।

অনাবিল শান্তিতে ভরে উঠে মনিরার হৃদয়।

ভাবে মনিরা, যে বনহুরকে পাবার জন্য লালায়িত কত শত শত নারী, আর সেই বনহুর তার স্বামী-কদিন আগের কথা মনে পড়ে মনিরার, বান্ধবী সুফিয়ার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যায় কোনো এক বিয়ে বাড়িতে। কোনো এক কথায় বনহুরের কথা উঠে মহিলা মহলে। মনিরা নিশ্চুপ শুনে যায়, তার কান সজাগ ছিলো এ ব্যাপারে।

বললো সুফিয়া-দস্যু বনহুরকে আমি চিনি, আমি তাকে দেখেছি। সে এক অপূর্ব মহাপুরুষ।

বলছিলো মাধবী সেন-দস্যু বনহুর শুধু দেবপুরুষ নয়, তার সৌন্দর্য সবাইকে অভিভূত করে।

আরিফা উচ্ছল কণ্ঠে প্রতিধ্বনি তোলে-যে কোনো নারী তাকে না ভালবেসে পারে না, শুনেছি তাকে পাবার জন্য বহু নারী নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছে।

মালতী দেবী বলেছিলো-বনহুরকে একটিবার যদি দেখতাম তবু জীবন সার্থক হতো, সে নাকি অদ্ভুত অপূর্ব সুন্দর।

সুফিয়া জবাব দিয়েছিলো-আমি তাকে দেখেছি, কোনোদিন তাকে ভুলবো না। সে শুধু সুন্দর নয় তার বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর একবার যার কানে প্রবেশ করেছে সে কোনো দিন তার সেই কণ্ঠস্বর বিস্মৃত হবে না। তারপর আপন মনেই বলেছিলো সে-আমি তাকে যে বেশে দেখেছিলাম তা চিরদিন স্মরণ থাকবে।

মনিরার মনে প্রশ্ন জেগেছিলো তাই সে চুপ থাকতে পারেনি, বলেই বসেছিলো মনিরা-সুফিয়া, তুমি তাকে দেখেছো?

অনাবিল এক আনন্দ ঝরে পড়েছিলো সুফিয়ার চোখেমুখে। কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে মনে মনে স্মৃতিমন্থন করছিলো সে, তারপর বলেছিলো-দেখেছি, সে এক দীপ্তিময় পুরুষ যার সঙ্গে আর কোনো পুরুষের তুলনা হয় না।..বলতে বলতে আনমনা হয়ে পড়েছিলো সুফিয়া।

বনহুর সম্বন্ধে আলোচনায় সবাই যেন উচ্ছল হয়ে উঠেছিলো সেদিন, এমন কি রশিদা বেগম বৃদ্ধা তিনিও বনহুরের নামে পুত্রসুলভ স্নেহভরা কণ্ঠে বলেছিলেন-বনহুর শুধু সুদর্শন পুরুষই নয়, সে গরিব অসহায় দুঃস্থ মানুষের বন্ধু…আরও বলেছিলেন তিনি-দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করার জন্য পুলিশ মহল ব্যতিব্যস্ত হয়ে বেড়ালেও তারা কোনো দিন তাকে কাবু করতে পারবে না, কারণ তার উপর রয়েছে হাজার নর-নারীর এবং অসহায় মানুষের দোয়া…

মনিরার গন্ড বেয়ে সেদিন গড়িয়ে পড়েছিলো ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু। কেউ দেখে ফেলে এই ভয়ে সে মুখ ফিরিয়ে আড়ালে চোখ মুছে নিয়েছিলো।

বনহুর বলে উঠলো-কি ভাবছো মনিরা?

মনিরা নিশ্চুপ।

বনহুর ওর গন্ড স্পর্শ করে চমকে উঠে বলে-তুমি কাঁদছো মনিরা। কথাটা বলে বনহুর সুইচ টিপে আলো জ্বালতে যায়।

মনিরা বলে উঠে-থাক, আলো না জ্বালাই ভাল।

বলে বনহুর-কতদিন তোমার মুখ দেখিনি মনিরা। একটু দেখতে দাও।

না থাক।

বনহুর ফিরে আসে মনিরার পাশে। চিবুকটা তুলে ধরে গন্ডে হাত বুলিয়ে বলে- হঠাৎ চোখে পানি কেন মনিরা?

জানি না।

বুঝেছি তুমি আমার উপর অভিমান করেছো?

না গো না।

তবে কথা বলছো না কেন?

ভাবছি অনেক কথা।

বলবে না মনিরা?

বলবো কিন্তু আজ নয়।

কি এমন কথা যা আমাকে নিশ্চুপ করে দিয়েছে।

ওগো সে তোমারই কথা।

আমার কথা

হা।

মনিরা, তুমি সব সময় আমার কথা ভাবো? একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলে বনহুর-জানি না কেন তুমি সর্বক্ষণ আমার কথা চিন্তা করো।

তুমি বুঝবে না স্বামী নারীর কতবড় জিনিস

তাই বলে তুমি

তোমার কথা ভেবে আমি যে পরশ শান্তি পাই।

মনিরা।

বলো?

কত পবিত্র তুমি! তোমাকে স্পর্শ করতে আমার ভয় হয়।

ওগো এ তুমি কি বলছো?

সত্য মনিরা। তুমি ফুলের মত পবিত্র, তুমি চাঁদের আলোর মত নির্মম স্বচ্ছ, তাই....

তুমিও তো....

আমি এক হতভাগা-পাপী অপরাধী...

তুমি হতভাগা পাপী অপরাধী এ কথা তুমি ভাবলেও আমরা সবাই জানি তুমি কত মহান কত মহৎ কত পবিত্র...

মনিরা, এই যদি ভাবো তাহলে আমার কোনো দুঃখ-ব্যথা নেই। মনিরা...গভীর আবেগে বনহুর মনিরাকে আরো নিবিড়ভাবে কাছে টেনে নেয়।

মুক্ত জানালার ফাঁকে নিশীথ রাতের দমকা হাওয়া প্রবেশ করে ছড়িয়ে পড়ে বনহুর আর মনিরার শরীরে।

বনহুরের চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে মনিরা-এবার সংসারী হও।

সংসারী হবার বড় সাধ হয় কিন্তু উপায় নেই মনিরা।

কেন?

তুমি নিজের মনকে প্রশ্ন করো। একটু থেমে বললো বনহুর-তোমার সন্তান সেই তো আমাকে ক্ষমা করবে না মনিরা।

কিন্তু...

কোনো কিন্তু নেই। আমাকে কেউ ক্ষমা করবে না।

তুমি জানো না নারী-পুরুষ সবাই তোমাকে কত ভালোবাসে।

হয়তো অনেকে বাসে তবে বেশির ভাগ মানুষ আমাকে ঘৃণা করে। পুলিশমহল তো আমাকে আটক করার জন্য বদ্ধপরিকর। তাই সংসারী হতে চাইলেও সংসার আমাকে গ্রহণ করবে না মনিরা।

তুমি কি চিরদিন এমনি করে লোকচক্ষুর আড়ালে আত্মগোপন করে

হাঁ, এ ছাড়া আমার কোনো উপায় নেই। বনহুর এমনভাবে কথাটা বললো যে মনিরা কোনো জবাব বা প্রশ্ন খুঁজে পেলো না। স্বামীর চুলের ফাঁকে নীরবে আংগুল বুলিয়ে চললো।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটার পর বললো বনহুর-জানো না মনিরা আজ পুলিশের শ্যেন দৃষ্টি এড়িয়ে কি ভাবে এখানে এসেছি।

আমার কিন্তু ভয় করছে।

ভয়! কিন্তু ভয় করে লাভ কি মনিরা। পুলিশ মহল শুধু আজ নয়, দীর্ঘদিন এমনভাবে চৌধুরীবাড়ির দিকে শ্যেন দৃষ্টি রেখে আসছে।

ওগো শুনেছি মিঃ জাফরী তোমার বন্ধু বনে গেছেন?

হাঁ।

এমনি করে পুলিশমহলকে তুমি বন্ধু বানিয়ে নিতে পারোনা?

তোমার সন্তান নূর যদি আমাকে সচ্ছভাবে পিতা বলে গ্রহণ করে নিতে পারতো তাহলে পুলিশমহল কথা শেষ না করেই থেমে যায় বনহুর, বলে উঠে-জানি তা কোনোদিন সম্ভব নয়। মনিরা, ভোর হয়ে আসছে, এবার আমাকে বিদায় দাও? বলে বিছানায় উঠে বসে বনহুর।

মনিরা স্বামীর জামার বোতাম লাগিয়ে দিতে দিতে বলে-বিদায় নয় বলে আসবে?

নিশ্চয় আসবো। বনহুর এবার শয্যা ত্যাগ করে এগিয়ে যায় মুক্ত জানালার দিকে। মুহূর্ত বিলম্ব না করে নেমে পড়ে সে।

পাইপ বেয়ে কিছুটা নামতেই শোনা যায় গুলীর শব্দ।

শিউরে উঠে মনিরা। বুকটা তার কেঁপে উঠে থর থর করে। তবে কি পুলিশমহল টের পেয়ে গেছে!

পর পর আবার কয়েকটা গুলীর শব্দ হলো।

সিঁড়িতে শোনা গেলো বুটের শব্দ।

একটু পরই দরজায় ধাক্কার শব্দ, পরক্ষণেই নূরের গলা শোনা গেলো আম্মু... দরজা খোলো আম্মু।

মনিরা চমকে উঠলো। তাহলে কি নূর এসেছে বনহুরকে গ্রেপ্তার করার জন্য পুলিশমহলকে নিয়ে।

মনিরা দরজা খুলে দিলো, চোখেমুখে তার উৎকণ্ঠার ছাপ ফুটে উঠেছে।

দরজা খুলতেই নূর ব্যস্তকণ্ঠে বললো-আম্মু, দস্যু বনহুর আমাদের বাড়িতে প্রবেশ করেছিলো না জানি কোন্ সর্বনাশ সে করে গেছে।

মনিরা নিশ্চুপ, কোনো কথা সে বললো না।

ততক্ষণে মরিয়ম বেগম এবং সরকার সাহেব এসে দাঁড়িয়েছেন, নিদ্রাজড়িত চোখে রাশিকৃত বিস্ময় ঝরে পড়ছে। চাকর বাকর তারাও এসে দাঁড়িয়েছে। সবার চোখেমুখে উৎকণ্ঠা।

মনিরার সম্মুখে এসে দাঁড়ালো নূর-আম্মু, দস্যু বনহুর আমাদের বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করেছিলো। দেখো তোমার হীরার হার সে নিয়ে গেছে কিনা?

মনিরা নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

নূর বলে কথা বলছেনা কেন আম্মু? বুঝেছি তুমি খুব ভয় পেয়ে গেছে। দাদী আম্মু, আম্মুকে তুমি দেখো, আমি দেখছি সে কিছু নিয়ে গেছে কিনা?

নূর দ্রুত এগিয়ে যায় আলমারীর দিকে, ড্রয়ার খুলে চাবি নিয়ে আলমারী খুলে ফেলে। নূর জানে তার মায়ের একটা মূল্যবান হীরার হার আছে যা তার আব্বু তার মাকে দিয়েছিলেন। নূর নিজ চোখে সেই হীরার হার দেখছে যা সাত রাজার ধন-আলমারী খুলে হীরার হারের গোপন ড্রয়ার খুলে কৌটা বের করে মেলে ধরে

চোখের সামনে। কৌটার মধ্যে হীরার হার তেমনিই রয়েছে যেমনটি রাখা হয়েছিলো।

নুর হীরার কৌটা ঠিক জায়গায় রেখে ফিরে আসে মায়ের পাশে, কতকটা আস্বস্ত কণ্ঠে বলে-আম্মু, দস্যু বনহুর তোমার হীরার হার নিতে পারেনি। যেমন ছিলো তেমনটিই আছে। আমি নিচে গিয়ে দেখি পুলিশ মহল দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হলো কিনা কথা শেষ করেই নূর নেমে যায় নিচে।

মরিয়ম বেগম যেন সব বুঝতে সক্ষম হলেন, তিনি ডেকে উঠলেন-নুর, ওরে শোন.... ওরে শোন্...

ততক্ষণে নূর নিচে নেমে গেছে।

এখনও চৌধুরীবাড়ির বাগান বাড়ির আশপাশ থেকে শব্দ ভেসে আসছে।

মনিরার বুকটা কেঁপে কেঁপে উঠছে, জানি না সে আহত অথবা নিহত কিছু হয়নি তো? মনিরার গন্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু?

মরিয়ম বেগম ব্যস্তভাবে এগিয়ে এলেন পুত্রবধূর পাশে, উকুণ্ঠাভরা কণ্ঠে বলে-ও কি এসেছিলো বৌমা?

হাঁ, এসেছিলো। বললো মনিরা।

তাহলে আমার মনির, এসেছিলো? সর্বনাশ, ওকে পুলিশে হত্যা করেছে। ওকে হত্যা করেছে....দেখছোনা গুলীর শব্দ হচ্ছে...

মামীমা, তুমি চুপ করে থাকো, যা হবার হয়ে গেছে। তুমি চুপ করে মামীমা।

না না, আমি চুপ করে থাকতে পারবো না। আমি চুপ করে থাকতে পারবো না। নূরকে আমি সব খুলে বলবো।

মামীমা, ধৈর্য ধরো। ভুল করোনা, এমন ভুল করলে তো কোনোদিন সংশোধন হবে না। নূর সব জানতে পারবে। কথাগুলো মনিরা অত্যন্ত চাপাকণ্ঠে বললো। কেউ যেন তার কথা শুনতে না পায়।

হঠাৎ মনিরা এবং অন্যান্য সবার কানে প্রবেশ করে অশ্ব পদশব্দ। দূরে অনেক দূরে কেউ যেন ঘোড়া ছুটিয়ে নিয়ে চলে যায়।

এবার মনিরার মুখমন্ডল শান্ত স্বাভাবিক হয়ে উঠে। কারণ সে বুঝতে পারে তার স্বামী নিহত হয়নি, জীবিত আছে এবং সে তার অশ্ব নিয়ে চলে যেতে পেরেছে।

*

মায়ের শয্যায় দেহটা এলিয়ে দিয়ে বলে নূর-আম্মু, একটা সুযোগ আমি হারালাম, বড় আফসোস হচ্ছে দস্যু বনহুরকে আয়ত্তে পেয়েও গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হলাম না।

মনিরা আলনায় কাপড়গুলো গুছিয়ে রাখছিলো, পুত্রের কথায় বললো সে- দস্যু বনহুর আমাদের কোনো ক্ষতি করেনি তবু কেন তাকে গ্রেপ্তারে তোমার এত আগ্রহ বলো তো নূর?

আম্মু, তুমি হঠাৎ এ ধরনের প্রশ্ন করে বসবে ভাবতে পারেনি। দস্যু বনহুর আমাদের কোনো ক্ষতি না করলেও সে জনগণের সর্বনাশ করেছে এবং করছে। আম্মু, আজ না হলেও একদিন না একদিন আমি দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করবোই। আম্মু, তুমি দোয়া করো যেন আমি সফলকাম হই।

এমন সময় মরিয়ম বেগম সেই কক্ষে প্রবেশ করলেন এবং বললেন-মা-ছেলে মিলে কি গল্প হচ্ছে শুনি?

মরিয়ম বেগমের কথায় মনিরা কোনো জবাব দিলো না।

নূর শয্যায় উঠে বসে বললো-দাদী আম্মু, এসো এবার তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলি। হয়তো আর সময় হবে না, কারণ এখন বিদায় নেবো।

ও কথা বলতে নেই দাদু! বললেন মরিয়ম বেগম।

কেন বলতে নেই? বললো নূর।

বলো আসবো।

মরিয়ম বেগমের কথায় হেসে উঠলো নূর। তারপর বললো-আবার আসবো এ সান্তনা নিয়েই তাহলে বিদায় নিতে হচ্ছে এখন।

আচ্ছা দূর?

বলল দাদী আম্মু?

এত বড় ডিটেকটিভ হয়েছিস শুধু কি ঐ দস্যু বনহুরকে পাকড়াও করবার জন্য না তোর আরও কাজ আছে? যেমন ধরু চোর গুন্ডা বদমাইস, স্মাগলার খুনী এমনি কত প্রকার দেশের শত্রু আছে।

হেসে বলে নূর-এ সবকে পাকড়াও করবার জন্য আছে পুলিশ মহল।

আর তুই বুঝি শুধু

হাঁ দাদী আম্মু, দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করে শাস্তি দেওয়াই আমার প্রধান উদ্দেশ্য তবে চোর। গুন্ডা বদমাইশ যারা দেশের ও দশের শত্রু তাদেরকেও আমি খুঁজে বের করতে পিছপা হবে না। দাদী আম্মু, দস্যু বনহুরকে তুমি জানো না, তাকে পুলিশমহল গ্রেপ্তার করেও আটক রাখতে পারেনি, এমনকি মিঃ জাফরীর মত পুলিশ সুপারকেও হিমসিম খাইয়ে ছেড়েছে।

আচ্ছা, নূর, মিঃ জাফরী নাকি দস্যু বনহুরকে বন্ধু বলে গ্রহণ করেছেন?

হাঁ দাদী আম্মু, মিঃ জাফরীকে কোনো এক বিপদ মুহূর্তে সহায়তা করেছে সে, তাই মিঃ জাফরী দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার থেকে বিরত আছেন।

মনিরা আলনায় কাপড় গুছিয়ে রাখছিলো, সে হাতের কাজ শেষ করে শাশুড়ি এবং পুত্রের পাশে এসে দাঁড়ালো।

নূর বললো-আম্মু, তুমিও বুঝি এলে দস্যু বনহুরকে নিয়ে আমার সঙ্গে তর্ক করতে?

না।

তবে তোমার মুখ দেখে কিন্তু আমি আন্দাজ করে নিয়েছি তুমি কিছু বলবে।

হাঁ, বলবো বলেই তো এগিয়ে এলাম।

বলো?

নূর, তুমি জানো না দস্যু বনহুর কত মহৎ? জানলে তার পিছু লাগতে না।

আম্মু, তুমি যতটুকু তার সম্বন্ধে জানো তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি জানি বা জানতে পেরেছি…

চুপ করো নূর, আর শুনতে চাই না। কথাটা বলে বেরিয়ে গেলো মনিরা।

নূর কিছুটা বিস্ময় প্রকাশ করে বললো-দাদী আম্মু, আমি ঠিক বুঝতে পারি না আম্মু দস্যু বনহুর সম্বন্ধে কথা উঠলে কেমন যেন বিব্রত হয়ে পড়েন।

যাক ওসব কথা!

না দাদী আমু, তোমরা দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারের ব্যাপারে আমাকে উৎসাহ না জুড়িয়ে শুধু নিরুৎসাহ করে। জানোনা দাদী আম্মু, দস্যু বনহুরকে যদি আমি গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হই তাহলে আমার সাধনা সার্থক হবে, আমি জয়যুক্ত হবো।

মরিয়ম বেগম অস্ফুট কণ্ঠে বললেন-নূর!

হাঁ দাদী আম্মু, দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করে আমি স্বনামধন্য ডিটেকটিভ হতে চাই।

নূর, তুই ভুল করবি। যে ভুলের কোনো সমাধান খুঁজে পাবি না। তুই জানিস না সে

মনিরা ঐ মুহূর্তে ঝড়ের মত কক্ষে প্রবেশ করে। সে কক্ষ হতে বাইরে গেলেও দরজার ওপাশে রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে পুত্র ও শাশুড়ির কথা শুনছিলো। যে মুহূর্তে মরিয়ম বেগম বললেন নূর তুই ভুল করবি-যে ভুলের কোনো সমাধান খুঁজে পাবি না-না জানি এর পর কি বলে বসবেন কে জানে, তাই মনিরা দ্রুত কক্ষে প্রবেশ করে বললো, মামীমা, নূরকে যেতে দাও। ওর অনেক কাজ আছে।

নূর বলে উঠলো-আম্মু, তুমি ঠিক বলেছো, অনেক কাজ আছে, এবার তাহলে আসি।

মরিয়ম বেগম বললেন-দাদু আবার কিন্তু এসো।

আসবো। কথাটা বলে উঠে পড়লো নূর।

মরিয়ম বেগম তাকে সিঁড়ির মুখ অবধি এগিয়ে দিলেন।

মনিরা ইচ্ছা করেই সরে রইলো ঐ সময়। কারণ তার মনটা বড় অপ্রসন্ন ছিলো, নুরের কথাগুলো তার কানের কাছে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিলো। নুর যতদিন ছোট ছিলো তখন সে যা কিছু বলুক সহ্য হতো এখন মনিরা কিছুতেই যেন নুরের উক্তিগুলোকে বরদাস্ত করতে পারছিলো না। কেন দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার ছাড়া তার কি আর অন্য চিন্তা থাকতে পারে না? দস্যু বনহুর ছাড়া আরও অনেক দুষ্কৃতিকারী রয়েছে যারা জনগণের ক্ষতি সাধন করে চলেছে।

মনিরার মনটা বিষণ্ন হয়ে যায়, স্বামীর চিন্তায় সে অস্থির হয়ে পড়ে, তার কোনো ক্ষতি হয়নি।

মনিরা আনমনে দাঁড়িয়ে ছিলো জানালার ধারে।

মরিয়ম বেগম তার পেছনে এসে দাঁড়ালেন।

বললেন–বৌমা!

চমকে উঠে ফিরে তাকালো মনিরা।

মরিয়ম বেগম বুঝতে পারলেন মনিরার মনে একটা গভীর চিন্তার ছাপ পড়েছে। একদিকে স্বামী অপরদিকে সন্তান, কি করবে সে, কোন দিকে যাবে। স্নেহভরা কণ্ঠে বললেন মরিয়ম বেগম বৌমা, ভেবে আর কি হবে, ভাগ্যে যা ছিলো তাই ঘটছে। ভাগ্যকে পরিহার করার মত আমাদের কোনো শক্তি নেই।

মনিরা আঁচলে চোখ মুছে বললো–জানি মামীমা, তবু মাঝে মাঝে মন বিদ্রোহী হয়ে উঠে। স্বামী সন্তান কেউ আমার ব্যথা বুঝলো না।

জীবনভর শুধু চোখের পানিই ফেললি মনিরা। মন খুলে হাসতে দেখলাম না কোনোদিন। বড় হতভাগী তুই, তাই চোখের পানি তোর নিত্য সাথী।

মনিরার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলো, সে কোনো কথা বলতে পারলো না, জড়িয়ে ধরলো মরিয়ম বেগমকে, উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো সে।

সরকার সাহেব এসে দাঁড়ালেন, বললে তিনি–কেঁদে কি হবে বৌমা? জীবনটা একটা মেশিনের মত–তাকে চলতেই হবে, না চলে যে কোনো উপায় নেই মা।

মরিয়ম বেগম পুত্রবধুর পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে সরকার সাহেবের কথায় যোগ দিয়ে বললেন–ঠিকই বলেছেন জীবনটা একটা যন্ত্র বা মেশিনের মত। ইচ্ছে না থাকলেও চলতে হবে। প্রতিদিনের নিয়ম মতই কাজ করে যেতে হবে। তুই তো জানিস বৌমা, কত ব্যথা কত যন্ত্রণা বুকে চেপে আমি সোজা হয়ে পথে চলছি। লোকে বলে আমি কত সুখী–কোনো অভাব–অভিযোগ আমার নেই। কিন্তু তারা জানে না ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যে মানুষের মনের অভাব পূরণ হয় না।

সরকার সাহেবের চোখ দুটো অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো, তিনি রুমালে চোখ মুছে বললেন–বেগম সাহেবা যা বললেন তা সত্যি–ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য মানুষের দৈহিক অভাব পূরণ করতে পারে কিন্তু মনের অভাব পূরণ করতে পারে না। বেগম সাহেবা, আপনি বেশি চিন্তা করলে অসুস্থ হয়ে পড়বেন। এবার যেন একটু অন্য চিন্তায় মন দিন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন মরিয়ম বেগম।

সরকার সাহেব নিজ কাজে চলে গেলেন।

মনিরা আঁচলে চোখের পানি মুছে ফেললো।

*

বনহুর আস্তানায় প্রবেশ করতেই রহমান মশাল হাতে এসে দাঁড়ালো, সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো–সর্দার! আপনি আহত।

মশালের আলোতে স্পষ্ট দেখতে পেলো বনহুরের জামার বামপাশের জামাটা রক্তে জন্য জ করছে। চুলগুলো এলোমেলো।

রহমান তার দক্ষিণ হাতে মশাল ধরে আছে, সে সর্দারকে ধরতে পারছে না।

ততক্ষণে কায়েস আর হারুন এসে দাঁড়ালো।

রহমান ইংগিত করতেই কায়েস ও হারুন ধরে ফেললো বনহুরকে এবং তাকে নিয়ে চললো আস্তানার ভিতরে।

নূরীর দরজায় পৌঁছতেই নুরী আর্তনাদ করে উঠলো–তোমার এ অবস্থা কেন?

বনহুরকে সে ধরে শয্যায় শুইয়ে দিলো।

পাশে বসে ব্যাকুল কণ্ঠে বললো কি করে এমন অবস্থা হলো তোমার বলো?

বনহুর কোনো জবাব না দিয়ে চোখ বুজে রইলো।

বনহুরের শিয়রে দাঁড়িয়ে রহমান, কায়েস এবং হারুন।

রহমানের হাতে মশাল তখনও ধরা রয়েছে।

সবার চোখেমুখে উদ্বিগ্নতার ছাপ ফুটে উঠেছে। তারা সর্দারের জন্যে ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েছে।

নূরী বারবার বনহুরের গন্ডদেশে এবং চিবুকে হাত বুলিয়ে বলছে–কথা বলছে না কেন হুর কেমন করে এমন অবস্থা হলো?

বনহুর বললো–পুলিশের গুলী আমার বাম পাঁজরের পাশের চামড়া ভেদ করে বেরিয়ে গেছে তাই প্রচুর রক্ত ক্ষয় হচ্ছে। তবে ঘাবড়াবার কিছু নেই। এক্ষুণি সেরে উঠব।

রহমান বললো–ডাক্তার আনতে হবে সর্দার?

বনহুর বললো–না, ডাক্তার লাগবে না।

নূরী বললো–ডাক্তার লাগবে। যাও রহমান ভাই।

এমন সময় ফুল্লরা এসে দাঁড়ালো সর্দার... তোমার একি হয়েছে? একি হয়েছে...আঁচলে চোখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

ফুল্লরা সর্দারকে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে। সে যদি সেদিন তাকে উদ্ধার না করতো তাহলে আজ ফুল্লরা নিজকে হারিয়ে ফেলতে চিরদিনের জন্য। কোনোদিন হয়তো ফিরে আসতে পারতো না তার মা–বাবার পাশে।

সর্দারের প্রতি ফুল্লরার আন্তরিক দরদ রয়েছে, তাই সে বনহুরের অবস্থা দেখে খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লো, নিজকে কিছুতেই সংযত রাখতে পারলো না, উচ্ছ্বসিত আবেগে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

বনহুর ওকে ডাকলো এসো, আমার পাশে এসো ফুল্লরা।

ফুল্লরা এসে দাঁড়ালো বনহুরের পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে।

বনহুর সস্নেহে ওকে কাছে টেনে নিয়ে বললো– ফুল্লরা, আমার জন্য তুমি কাঁদছো? কিন্তু আমার তো কিছু হয়নি। এই তো সেরে উঠবো এখন। ওকি তবু চোখে পানি? ছিঃ কাঁদতে নেই...ফুল্লরার চোখের পানি বনহুরকে ব্যথিত করে তুললল, তার কণ্ঠস্বর বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এলো।

বনহুরের আঘাত তেমন গুরুতর না হলেও বেশ কিছুদিন তাকে শয্যা ত্যাগ করতে দিলো না নূরী। সর্বক্ষণ তার পাশে পাশে তাকে অক্টোপাশের মত ঘিরে রইলো।

ফুল্লরা সেবা করতো সর্দারের।

একদিন সে সর্দারকে জিজ্ঞাসা করে বসলো–সর্দার, সত্যি করে একটা কথা তুমি আমাকে বলবে?

হেসে বললো বনহুর–বলো বলবো।

ফুল্লেরা বনহুরের মুখে স্থিরদৃষ্টি রেখে বললো–ঠিক করে বলবে এ আঘাত তোমাকে কে করেছে।

বনহুর গম্ভীর হয়ে বললো এ প্রশ্ন ছাড়া তুমি অন্য যে কোনো প্রশ্ন করতে পারো ফুল্লরা, আমি সঠিক জবাব দেবো।

সর্দার, আমি জানি তুমি কোনোদিন মিথ্যা কথা বলোনা, তাই আমার বিশ্বাস আজ আমি যে প্রশ্ন করেছি তার সঠিক জবাব দেবে।

ফুল্লরা বেশ ভারী গলায় সর্দারকে লক্ষ্য করে কথাগুলো বললো।

এবার বনহুর ওকে টেনে নিলো কাছে, স্নেহে মাথায় হাত বুলিয়ে বুলিয়ে বললো–ফুল্লরা, এই আঘাত আমি পেয়েছি পুলিশ বাহিনীর কাছ থেকে।

পুলিশ বাহিনী তোমাকে আঘাত করলো আর তুমি তা নীরবে সহ্য করলে? সর্দার, পুলিশ বাহিনীর এই আঘাত তুমি কিছুতেই বরদাস্ত করবে না। এর প্রতিশোধ তোমাকে নিতেই হবে।

হাসলো বনহুর।

ফুল্লরা অভিমানভরা কণ্ঠে বললো–এতবড় আঘাত তুমি পেলে অথচ....

এমন সময় ভারী বুটের শব্দে সবাই চমকে ফিরে তাকালো।

নূরী আনন্দে উচ্ছল কণ্ঠে বলে উঠলো–জাভেদ তুই এসেছিস বাবা?

জাভেদ মায়ের মুখে দৃষ্টি রেখে বললো–হা আম্মি, আমি এলাম! বাপু নাকি ভীষণ আহত হয়েছেন, এ কথা জানতে পেরে

ফুল্লরা তাড়াতাড়ি সরে দাঁড়ালো একটু দূরে। তার চোখেমুখে আনন্দোচ্ছাস ফুটে উঠেছে। জাভেদকে সে কতদিন দেখেনি। ওর মনটা খুব উদগ্রীব ছিলো এতদিন। জাভেদ যখন কথা বলছিলো তার মা ও বাপুর সঙ্গে তখন ফুল্লরা তাকিয়ে থাকে নির্বাক চোখে ওর দিকে। ফুল্লরার ছোটবেলার সাথী জাভেদ যেমন বনহুরের শিশুবেলায় সর্বক্ষণের সাথী ছিলো নুরী তেমনি ফুল্লরা আর জাভেদ।

ফুল্লরা ছোটবেলায় চুরি হয়ে গেলো।

মালোয়া তাকে নীলমনি হার সহ চুরি করে নিয়ে দূরে বহুদূরে চলে গিয়েছিলো। তাকে নাচতে শিখিয়েছিলো এমনকি শহরে শহরে নগরে বন্দরে তাকে নাচিয়ে পয়সা উপার্জন করতে মালোয়া।

যা হোক, মালোয়ার একটা গুণ ছিলো সে ফুল্লরাকে একা পেয়েও কোনোদিন তার উপর জঘন্য আচরণ করেনি। চেয়েছিলো ফুল্লরা বড় হয়ে তাকে আত্মসমর্পণ করতে কিন্তু তা করেনি। তাই শেষ দিকটায় মালোয়া ওকে জোরপূর্বক আয়ত্তে আনতে চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু সে বিফলকাম হয়েছে।

ফুল্লরা কালনাগিনীর মত তাকে ছোবল মেরেছে, তাই মালোয়ার ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। তবে কতদিন আর সে নিজকে মালোয়ার কাছ থেকে হেফাজতে রাখতে পারতো তা সঠিক করে বলা যায় না। বলা যায় না ফুল্লরা এতদিন জীবিত থাকতে পারতো কিনা। ভাগ্যিস সর্দার দেবদূরের মত গিয়ে হাজির হয়েছিলো সেদিন তাই রক্ষা....

ফুল্লরার চিন্তাধারায় বাধা পড়ে, জাভেদ তখন বলছে–বাপু, আমি জানি কে, তোমার শরীরে আঘাত করেছে, আমি তাকে উচিত শিক্ষা দেবো।

বনহুর বললো–পুলিশবাহিনীর গুলী আমার শরীরের কিছু অংশ ভেদ করেছিলো তাই....

পুলিশবাহিনীকে উদ্বুদ্ধ করেছিলো কে। প্রখ্যাত গোয়েন্দা নুরুজ্জামান চৌধুরী। আমি তাকে শায়েস্তা না করে ছাড়বো না। দাতে দাঁত পিষে বললো জাভেদ।

ঠিক যেমন করে বলে বনহুর।

নূরী পুত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো, সে যেন ভাষা হারিয়ে ফেলেছে।

জাভেদ যেমন এসেছিলো তেমনি বেরিয়ে গেলো ঝড়ের বেগে।

আস্তানার কেউ তাকে বাধা দিতে পারলো না।

এমনকি বনহুরও কিছু বলবার আগেই বেরিয়ে গেলো সে।

আস্তানার মুখে পথ আগলে দাঁড়ালো ফুল্লরা।

জাভেদ থমকে দাঁড়ালো, ফিরে তাকালো সে ফুল্লরার মুখের দিকে।

চোখে চোখ পড়তেই জাভেদ কুচকে দাঁড়ালো।

ফুল্লরা হেসে বললো– আমাকে চিনতে পারছো না? আমি ফুল্লরা, তোমার খেলার সাথী। ছিলাম একদিন

ফুল্লরা।

হাঁ জাভেদ।

পথ ছাড়ো।

না।

কেন?

কতদিন তুমি আসোনি…

ফুল্লরা পথ ছাড়ো, আবার আসবো।

সত্যি কথা দিচ্ছো?

হাঁ দিলাম। কথাটা বলে জাভেদ বেরিয়ে গেলো দ্রুতগতিতে।

ফুল্লরা নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, তার চোখ দুটো আনন্দদীপ্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

খুশি উপচে পড়ছে যেন ফুল্লরার সারা অঙ্গে।

*

নূর চমকে ফিরে তাকালো।

পেছনে কালো কাপড়ে মুখের অর্ধেক ঢাকা গায়ে জমকালো পোশাক এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে, হাতে তার রিভলভার।

মুহূর্ত বিলম্ব না করে নূর ড্রয়ার খুলবার জন্য হাত বাড়াতেই জমকালো মূর্তি তার পিঠে রিভলভার চেপে ধরলো–খবরদার!

নূরী ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো।

ভালভাবে লক্ষ্য করছিলো ছায়ামূর্তির পা থেকে মাথা পর্যন্ত। সে প্রথম নজরেই বুঝতে পারলো এ ছায়ামূর্তি স্বয়ং দস্যু বনহুর নয়, তবে ঠিক তারই মত হয়তো বা কোনো এক দস্যু বা ডাকু।

কি দেখছো অমন করে? জমকালো পোশাকপরা ছায়ামূর্তি বললো।

বললো নূর–কে তুমি তাই চিনবার চেষ্টা করছি।

ও, চিনতে পারোনি তাহলে?

দস্যু বনহুর তুমি নও জানি।

হাঁ।

তবে তুমি কে?

পরিচয় জেনে তোমার কোনো লাভ হবে না। তুমি এখন মৃত্যু পথযাত্রী

নূর এতক্ষণ বসেই শুনছিলো, এবার সে উঠে দাঁড়ালো এবং আচমকা প্রচন্ড এক ঘুষি বসিয়ে দিলো জমকালো মূর্তির চোয়ালে।

ছায়ামূর্তি অন্য কেউ নয়–জাভেদ। সে নূরের ঘুষিতে হুমড়ি খেয়ে পড়লো না। সামান্য কাৎ হয়ে পড়লো একটা চেয়ারের উপরে, সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পাল্টা ঘুষি বসিয়ে দিলো। নূরের চোয়ালে।

নূর টাল সামলে নিলো এবং জাপটে ধরলো জমকালো পোশাক পরিহিত জাভেদকে।

শুরু হলো মল্লযুদ্ধ। ঠিক ঐ মুহূর্তে কয়েকজন সশস্ত্র পুলিশ প্রবেশ করলো ভিতর দরজা দিয়ে।

পুলিশগণ চারপাশ থেকে ঘিরে ধরলো। তখনও চলেছে মল্লযুগ্ধ নূর এবং জাভেদ মিলে।

হাতে অস্ত্র থাকলেও পুলিশগণ তারা অস্ত্র ব্যবহার করতে সক্ষম হচ্ছে না। কারণ যে কোনো মুহূর্তে নূর আহত অথবা নিহত হতে পারে।

জাভেদ পুলিশবাহিনীকে গুলী ছোঁড়ার সুযোগ দিলো না। নূরকে সম্মুখে ধরে পিছু হটতে লাগলো। হঠাৎ নূর জাভেদের চোয়ালে বসিয়ে দিলো এক প্রচন্ড ঘুষি।

জাভেদ ধাক্কা খেয়ে পড়লো ওদিকের দরজার উপরে। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেলো, পড়ে গেলো জাভেদ দরজার পাশে মেঝেতে।

পুলিশবাহিনী গুলী ছুড়লে তাকে লক্ষ্য করে।

কিন্তু ততক্ষণে জাভেদ বাইরে বেরিয়ে গেছে।

পুলিশবাহিনী গুলী ছুঁড়তে লাগলো এলোপাতাড়ি।

জাভেদ অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসেছে।

উল্কা বেগে ছুটতে শুরু করলো জাভেদের অশ্ব।

পুলিশবাহিনী দোতলার রেলিং থেকে অবিরাম গুলী নিক্ষেপ করে চললো।

নূর সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলো নিচে।

রিভলভার রেখে দিলো সে কোমরের বেল্টে। গাড়ি–বারান্দায় গাড়ি অপেক্ষা করছিলো, নূর গাড়িতে চেপে বসলো, তারপর ছুটলো সে উল্কাবেগে।

যেদিকে অশ্বপদ শব্দ শোনা যাচ্ছিলো সেইদিকে গাড়ি ছুটালো নূর।

শহর ছেড়ে গ্রামাঞ্চলের পথ ধরলো জাভেদ।

নূর তার অশ্বপদ শব্দ লক্ষ্য করে গাড়ি চালাচ্ছে। আঁকাবাঁকা পথ সে অতিক্রম করে এগুচ্ছিলো। উদ্দেশ্য যেমন করে হোক অশ্বারোহীকে সে গ্রেপ্তার করবেই। গাড়িতে বসেই রিভলভারখানা বের করে ড্রাইভিং আসনের পাশেই রেখেছিলো। নাগালের মধ্যে পেলেই সে গুলী ছুড়বে।

কিন্তু কিছুতেই সে সুযোগ আসছিলো না।

নূর যত দ্রুত গাড়ি চালিয়ে অশ্বটাকে আয়ত্তের মধ্যে আনতে চাইছে ততই জাভেদ তার অশ্বটাকে এলোপাতাড়িভাবে চালনা করছিলো।

রাজপথ এড়িয়ে গ্রাম্যপথ তারপর জঙ্গলের পথ ধরে এগিয়ে চলেছে জাভেদ তার অশ্ব নিয়ে, যেন তাকে কিছুতেই পাকড়াও করতে না পারে। অবশ্য জাভেদের মনে একটা উদ্দেশ্য আছে নূরকে আয়ত্তের মধ্যে আনতে পারলে তাকে পাকড়াও করবে।

বেশ কিছুদূর এসে জঙ্গলের কাছাকাছি গাড়িখানা থেমে গেলো আচমকা।

নুর হকচকিয়ে গেলো।

তার গাড়িখানা এভাবে আটকে যাবে ভাবতেও পারেনি সে, দেখলো সেই জমকালো মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে তার সম্মুখে।

মুহূর্ত ভাববার সময় না দিয়ে জাভেদ নূরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

নূর সেই দন্ডে গুলী করলো তার বুক লক্ষ্য করে।

জাভেদ মাথাটা কাৎ করে উবু হয়ে পড়লো।

গুলীটা তার পাশ কেটে চলে গেলো।

জাভেদ গাড়ির ভিতরে বুকে চেপে ধরলো নূরের বুকে রিভলভারখানা।

নূর সুবোধ বালকের মত গাড়ি থেকে নেমে পড়লো কিন্তু পর মুহূর্তেই সে ভীষণ এক আঘাত হানলো জাভেদের দেহে।

ছিটকে পড়লো জাভেদ।

পরক্ষণেই চোখের পলকে সে উঠে দাঁড়ালো, তার দুহাতে দুটি মারণাস্ত্র। চোখ দুটি দিয়ে যেন তার আগুন বের হচ্ছে।

নূরের হাত থেকে তার অস্ত্র পড়ে গিয়েছিলো, তাই সে হাত তুলে দাঁড়াতে বাধ্য হলো।

*

নূরকে বন্দী অবস্থায় যখন দুবারকক্ষে নিয়ে যাওয়া হলো তখন তার দুচোখে কালো রুমাল বাধা ছিলো, হাত দুখানা পিছমোড়া করে বাঁধা।

হাজির করা হলো দরবারকক্ষে।

চোখের বাধন খুলে দেবার সঙ্গে সঙ্গে নূর চমকে উঠলো, তার সম্মুখে সুউচ্চ আসনের পাশে দন্ডায়মান জমকালো পোশাক পরা এক ব্যক্তি।

জমকালো পোশাক পরা ব্যক্তিই যে স্বয়ং দস্যু বনহুর চিনতে বাকি রইলো না নূরের। জমকালো মূর্তির পাশেই দন্ডায়মান সেই তরুণ যে তাকে কৌশলে বন্দী করে আনতে সক্ষম হয়েছে।

জমকালো মূর্তির মুখ অর্ধেক ঢাকা।

মাথায় কালো পাগড়ি।

শুধুমাত্র চোখে দুটো নজরে পড়ছে নূরের।

বনহুরও যে চমকে উঠেনি তা নয়, কিন্তু মুহূর্তে নিজকে সামলে নিলো। যদি তার মুখমন্ডলের কিছু অংশ জমকালো কাপড়ে ঢাকা না থাকতো তাহলে তার মুখোভাব পরিবর্তন লক্ষ্য করে জাভেদ বিস্মিত না হয়ে পারতো না।

ভাগ্যিস বনহুরের মুখের কিছু অংশ ঢাকা ছিলো তাই রক্ষা, না হলে কিছুতেই নিজকে এবং জাভেদের দৃষ্টি থেকে আড়াল রাখতে পারতো না।

বনহুর দেখলো নূরকে, প্রখ্যাত ডিটেকটিভ নূর তারই ছেলে। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলো ওর মুখের দিকে।

নূর দাতে দাঁত পিষছিলো, ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিলো বনহুরের দিকে।

জাভেদ দক্ষিণ হাতে পিস্তল দোলাচ্ছিলো, তার মুখে জয়ের উল্লাস ফুটে উঠেছে। তাকাচ্ছিলো সে একবার বাপুজীর মুখে, আবার বন্দী নূরের দিকে।

বনহুরকে নিশ্চুপ থাকতে দেখে বললো জাভেদ–সর্দার, এই সেই গোয়েন্দা যে আপনার দেহে গুলীবিদ্ধ করেছিলো। আমি ওকে কৌশলে বন্দী করে এনেছি। এবার উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া দরকার।

জাভেদের কথাগুলো বড় কঠিন ছিলো।

নূর শুধু তাকিয়ে ছিলো, সে কোনো কথা বলছে না, হিংস্র সিংহের মত ফুলছে ভিতরে ভিতরে।

বনহুর জাভেদের কথায় যেন সম্বিৎ ফিরে পেলো, বললো–বন্দীই আমাকে গুলীবিদ্ধ করেছিলো তার প্রমাণ যদিও নেই তবু আমি বন্দীকে আটক রাখতে বাধ্য হবো, কারণ সে আমাকে গ্রেপ্তার করতে সর্বক্ষণ সজাগ রয়েছে।

হাঁ, শুধু তাই নয়, বন্দীকে আটক রেখে পুলিশবাহিনী ও গোয়েন্দা বিভাগকে শায়েস্তা করতে হবে। তারা জানে না দস্যু বনহুর কত শক্তিমান আর কঠিন... কথাগুলো বলে জাভেদ সর্দারের মুখের দিকে তাকালো।

দরবারকক্ষে যারা ছিলো তাদের সবারই মুখে পাগড়ির আঁচল জড়ানো। নূর কারো মুখ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না। যদি সে স্পষ্ট দেখতো তাহলে আর একজনকে সে চিনতে পারতো সে হলো রহমান।

দরবারকক্ষে বেশ কয়েকটা মশাল জ্বলছে। মশালের আলোতে বনহুরের অনুচরদের সবাইকে অদ্ভুত লাগছে। দেয়ালে নানা ধরনের অস্ত্র ঝুলছে। একপাশে পাকার জমকালো পোশাক।

নূর চারদিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখে নিয়ে বললো–দস্যু তোমরা আমাকে বন্দী করে কিছুতেই পুলিশবাহিনীকে শায়েস্তা করতে পারবে না। কারণ তারা তোমাদের সব ষড়যন্ত্র বানচাল করে দেবে।

অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো জাভেদ, তারপর হাসি থামিয়ে বললো–আমাদের ষড়যন্ত্র না তোমরাই ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছিলে দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করে তাকে হত্যা করবে, আর তাকে হত্যা করে অসৎ ব্যক্তিদেরকে দুষ্কর্ম করতে সুযোগ–সুবিধা করে দেবে!

নূর বলে উঠলো–অসৎ ব্যক্তি হলে তোমরা। তোমরা রাতের অন্ধকারে নিরীহ নগরবাসীর উপর হামলা করে তাদের যথাসর্বস্ব ছিনিয়ে নাও, হত্যা করো ঘুমন্ত মানুষগুলোকে।

না, আমরা কোনো সময় নিরীহ মানুষের উপর হামলা করি না। এ তোমার ভুল ধারণা। কথাটা গম্ভীর কণ্ঠে বললো বনহুর স্বয়ং।

নূর দাতে দাঁত পিষে বললো–তাহলে তোমরা নিজেদের সাধু বলতে চাও?

সাধুতা ভন্ডামি আমরা করি না তবে যারা দেশের ও দশের শত্রু আমরা তাদের রক্ত শুষে নেই…বনহুর এবার আসনের পাশ থেকে সরে এলো একপাশে, পুনরায় বললো–দেশকে যারা তিল তিল করে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে, যারা নিরীহ মানুষকে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে দিচ্ছে না, যারা জনগণের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে, তাদের আমরা ক্ষমা করি না।

নূর বলে উঠলো খুব তত বড় বড় বুলি আওয়াচ্ছে কিন্তু যত কথাই বলো রেহাই নেই তোমাদের। আমাকে তোমরা আজ আটক করলেও আটকে রাখতে পারবে না। মুক্ত আমি হবোই এবং দস্যু বনহুর, আমি তোমাকে বন্দী করবোই। শুধু তাই নয়, তোমাকে আমি তিল তিল করে হত্যা করবো যেমন তুমি হত্যা করেছে বহু মানুষকে।

জাভেদ ক্রুদ্ধ বাঘের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়লো নূরের উপর।

নূরের দেহ কিন্তু একটুও টললো না।

জাভেদ পিস্তল চেপে ধরলো নূরের বুকে–এই মুহূর্তে আমি তোমাকে হত্যা করবো।

বনহুর দ্রুত এগিয়ে এলো এবং জাভেদের পিস্তলসহ হাতখানা নামিয়ে দিলো নিচে। বললো—-না, ওকে হত্যা করো না জাভেদ।

জাভেদ অধরদংশন করে সরে দাঁড়ালো একপাশে।

বনহুর বললো যাও ওকে নিয়ে যাও। সাবধানে বন্দী করে রাখোগে।

কায়েস এবং রহমান নরকে বন্দীশালায় নিয়ে চললো। তার চারপাশে চললো বেশ কয়েকজন অস্ত্রধারী প্রহরী।

*

বনহুরের বন্দীশালায় বন্দী হয়ে নূর ভীষণ অস্থির হয়ে উঠলো। সে হিংস্র বাঘের মত ছটফট করতে লাগলো। ভাবতেও পারেনি এভাবে সে বন্দী হবে। যে বনহুরকে গ্রেপ্তার করার জন্য সে সাধনা করে চলেছে, সেই বনহুরের বন্দীশালায় তাকেই আটক হতে হলো।

মাথার চুল টেনে ছিঁড়েতে লাগলো নূর।

বারবার সে মেঝের পাথরখন্ডে বসে দুহাতের মধ্যে মুখ রেখে নিজের ক্রুদ্ধভাব দমন করার চেষ্টা করতে লাগলো।

রাতের খাবার পড়ে আছে এখনও।

দুপুরের খাবার দিয়ে গেছে কিন্তু তাও স্পর্শ করেনি নূর। সে খাবারের দিকে ফিরেও চায়নি একবারও।

কথাটা বনহুরের কানে গেলো।

সে ভ্রু ভ্রুকুঞ্চিত করে বললো–রহমান, তুমি যাও, নূর কাল থেকে খাবার মুখে দেয়নি।

কে বললো সর্দার এ কথা?

কায়েস বলেছে। নূর নাকি কাল থেকে মানে তাকে বন্দীশালায় আটক করার পর থেকে কিছু মুখে দেয়নি।

যাও তাকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করো।

সর্দার, আমার পক্ষে কিছু অসুবিধা হবে, কারণ...

হাঁ, আমি বুঝতে পেরেছি তুমি যা বলতে চাইছে। তোমাকে নূর চিনে ফেলতে পারে।

ঠিক বলেছেন সর্দার।

তাহলে কি কথা যায় বলো? শুধু তুমি জানো নুর আমার কে আর জানে আর একজন–সে হলো নূরী।

হাঁ সর্দার।

কিন্তু নূরীকে কিছুতেই এ কথা জানানো যাবে না। যদি সে জানতে পারে তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। রহমান।

বলুন সর্দার

একটা ব্যাপারে আমি পুলিশমহলের উপর খুব খুশি হয়েছি। তারা দস্যু বনহুর সম্বন্ধে সমস্ত ডায়রী এবং রেকর্ড গোপন রেখে নতুনভাবে ডায়রী তৈরি করে রেখেছে যার মধ্যে নূর খুঁজে পাবে না চৌধুরীবাড়ির সঙ্গে বনহুরের কোনো সম্বন্ধ আছে। অতি সূক্ষ্ম ভাবে কাজ করেছেন গোয়েন্দা প্রধান শংকর রাও। তিনি সকলের অগোচরে আত্মগোপন করে বনহুরের সন্তানকে দিয়ে বনহুরকে সায়েস্তা করতে চান।

সর্দার, শুনেছিলাম প্রখ্যাত গোয়েন্দা শংকর রাও নাকি বিদেশ গেছেন।

বিদেশ যাবার নাম করে তিনি গা ঢাকা দিয়েছেন।

এ কথা সত্যি সর্দার?

হাঁ, আমি আরও জানি শংকর রাও এখন কোথায় আছেন। একটু থেমে বললো বনহুর–শঙ্কর রাও আত্মগোপন করে সঠিকভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন! তারই নির্দেশমত পুলিশমহল দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারের ব্যাপারে কাজ করছে এবং কান্দাই পুলিশ অফিস থেকে সব রেকর্ড সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

সর্দার প্রখ্যাত গোয়েন্দা শঙ্কর রাও তাহলে…

বিদেশে যাননি, তিনি কান্দাই শহরেই আছেন।

তাহলে নূর কি তার নির্দেশমতই কাজ করছে?

নির্দেশ ঠিক নয়, তবে তাকে দিয়ে করানো হচ্ছে। রহমান, একটা কাজ করো–কায়েস অথবা হীরালালকে পাঠিয়ে নূরকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করো।

আচ্ছা সর্দার।

রহমান বেরিয়ে আসে সর্দারের বিশ্রামাগার থেকে।

আড়াল থেকে সব শুনে ফেলে নূরী। সে কোনো কাজে সর্দারের বিশ্রামাগারে প্রবেশ করতে যাচ্ছিলো, হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে শুনতে পায় বনহুর আর রহমানের কথাগুলো। বুঝতে পারে নূরকে বন্দী করে আনা হয়েছে কান্দাই আস্তানায় এবং সে বন্দী হবার পর থেকে কিছু মুখে দেয়নি।

নূরীর মাতৃহৃদয় ব্যথায় টনটন করে উঠলো। সে দূরের কথা স্মরণ করবার সঙ্গে সঙ্গে তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো নূরের শিশুকালের চেহারাটা। তার কচি মুখের আধো আধো বুলিগুলো প্রতিধ্বনি হলো নূরীর কানের কাছে।

মুহূর্ত বিলম্ব করলো না নূরী, যেমন সে আঁড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনেছিলো তেমনি আঁড়ালে থেকেই সরে গেলো আলগোছে।

একথালা খাবার নিয়ে হাজির হলো বন্দীশালার দরজায়।

বন্দীশালার ফটকে প্রহরী কিছু বলবার পূর্বেই বললো নূরী দরজা খুলে দাও।

অবাক হয়ে বললো প্রহরী–এ আপনি কি বলছেন?

যা বলছি করো, দরজা খুলে দাও।

সর্দারের নির্দেশ ছাড়া আমি দরজা খুলতে পারি না। বললো প্রহরী।

নুরী প্রহরীর বুক লক্ষ্য করে পিস্তল চেপে ধরলো। অপর দুজন জোয়ানকে বললো–একে বেঁধে রাখো মজবুত করে।

নূরীর সঙ্গেই তারা এসেছিলো, কাজেই নূরীর নির্দেশ মানতে তারা বাধ্য। নূরী ইঙ্গিত করার সঙ্গে সঙ্গে তারা প্রহরীকে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেললো।

এবার নূরী খুলে ফেললো কারাগারের দরজা।

প্রবেশ করলো সে ভিতরে।

ওপাশে একটা পাথরখন্ডের ওপর সালের খাবার এখন পড়ে আছে তেমনি। নূরীর সঙ্গে। একজন সহচরী এসেছে, তার হাতে খাবারের থালা।

নূরী বন্দী নূরের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো।

নূর ওদিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিলো।

নূরী বললো–বন্দী!

ফিরে তাকালো নূর।

দুচোখে তার বিস্ময়। অবাক হয়ে তাকালে সে নূরীর মুখের দিকে।

নূরীও কিন্তু আশ্চর্য দৃষ্টি নিয়ে দেখছিলো নূরকে। সেই ছোট্ট শিশুটি আজ কত বড় হয়েছে তার পিতার গভীর নীল চোখ দুটো যেন ওর চোখের মধ্যে ফুটে উঠেছে। বনহুরের মুখখানাই যেন সে দেখতে পেলো যেমন দেখতে পায় জাভেদের মুখে।

নূরী অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে নূরের মুখের দিকে।

নূরও কম বিস্মিত হয়নি, কারণ এই মহিলা তাকে এমন করে দেখছে কেন? তার মধ্যে কিসের সন্ধান সে করছে? কি খুঁজছে মহিলা।

নূরী বলে উঠলো–কি ভাবছো?

নূর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলো, কোনো জবাব দিলো না।

নূরী আরও এগিয়ে এলো ওর পাশে, একেবারে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালো।

নূর অন্যমনস্ক না হলেও সে বেশ উদাসভাবে দাঁড়িয়ে রইলো।

নূরী বললো–কাল থেকে কিছু মুখে দাওনি কেন?

এবার নূর ওর কথার মধ্যে খুঁজে পেলো মমতার ছোঁয়া। কে এই মহিলা কে জানে। নুর। নির্বাক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলো নূরীর দিকে।

নূরীর দুচোখের পাতা ভিজে উঠলো।

তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো নূরের ছোটবেলার মুখখানা। গন্ড বেয়ে দুফোঁটা পানি গড়িয়ে পড়লো তার। তাড়াতাড়ি নিজকে সামলে নিয়ে বললো নূরী–কিছু মুখে দাওনি কেন?

নূর নিশ্চুপ।

তার মনে বিস্ময়ের দোলা।

কে এই নারী?

কোনোদিন তাকে কোথাও দেখেছে কিনা।

না, স্মরণ হচ্ছে না তার।

নূরকে ভাবতে দেখে বলে নূরী–কি ভাবছো?

এবার কথা বললো নূর–সে কথা তোমার জেনে কোনো লাভ নেই। আমার যা ভাববার ভাবতে দাও।

না, তোমাকে এভাবে ভাবতে দেবো না।

চোখ দুটো বিস্ফারিত করে তাকায় নূর। ওর কণ্ঠস্বরে কেমন যেন অধিকারের সুর।

নূরী বলে– এসো খাবার খাও। নূরী তার সহচরীর হাত থেকে খাবারের থালাটা নিয়ে পাথরখটার উপরে রাখলো। পুনরায় বললো–এসো খাও!

নূর বললো–আমি খাই বা না খাই তাতে তোমার কি?

নূরী কিছু বলতে গেলো কিন্তু কণ্ঠ তার রুদ্ধ হয়ে এলো, শুধু বললো–সে তুমি বুঝবে না, খাও…

নূর এবার না করতে পারলো না, সে পাথরখন্ডটার পাশে এসে দাঁড়ালো।

নূরী থালাটা তুলে ধরলো নূরের সামনে।

নূর খেতে লাগলো।

পরিতৃপ্ত হলো নূরী।

ওর খাওয়া শেষ হলে যেমনভাবে বন্দীশালায় প্রবেশ করেছিলো তেমনিভাবে বেরিয়ে এলো নূরী আর তার সহচরী।

বন্দীশালার বাইরেই অপেক্ষা করছিলো প্রহরীদ্বয় যারা নূরী ও তার সহচরীর সঙ্গে এসেছিলো। নূরী বেরিয়ে আসতেই তারা বন্দীশালার দরজা বন্ধ করে দিলো।

এবার ওরা ফিরে চললো আস্তানার অভ্যন্তরে নিজ বিশ্রামাগারের দিকে।

নূরী যখন তার বিশ্রাম গুহায় প্রবেশ করতে যাচ্ছে তখন পথ আগলে দাঁড়ালো জাভেদ।

বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে পুত্রের মুখের দিকে তাকালো নূরী, অস্ফুট কণ্ঠে বললো– জাভেদ!

হাঁ, কোথায় গিয়েছিলে আম্মু?

তা তোকে বলতে হবে কেন?

আমি জানি তুমি কোথায় গিয়েছিলে।

বেশ তো, তাহলে কেন প্রশ্ন করছিস?

আম্মু, এমনভাবে বন্দীশালায় তোমার যাওয়া মোটেই সমীচীন হয়নি!

পথ ছাড় জাভেদ।

না।

কেন?

তোমাকে জবাব দিতে হবে কেন তুমি বন্দীশালায় গিয়েছিলে?

বন্দীকে দেখতে এবং তাকে খাওয়াতে গিয়েছিলাম।

বন্দীকে তুমি দেখতে এবং খাওয়াতে গিয়েছিলে আম্মু!

হাঁ।

চমৎকার।

পথ ছাড় জাভেদ।

না, তোমাকে জবাব দিতে হবে।

কেন তাকে দেখতে গিয়েছিলাম, কেন তাকে খেতে দিয়েছি…

হাঁ। সে একজন বন্দী। তাছাড়া সে আমাদের চরম শত্রু। শুধু শত্রুই নয়, বাপুকে সে গ্রেপ্তারের জন্য উম্মাদ, এমন কি জীবন দিয়েও সে বাপুকে গ্রেপ্তার করবে বলে শপথ করেছে। আর তুমি তাকে দেখতে এবং খাওয়াতে গিয়েছিলে?

হাঁ।

কিন্তু কেন?

বন্দী হলেও সে একজন মানুষ–তাছাড়া বয়স তার এমন বেশি নয়, তোর মতই…তাই…

তাই তুমি দয়া দেখাতে গিয়েছিলে?

হাঁ, বন্দী হলেও সে…

তোমার সন্তানের মত, তাই না আম্মু?

সত্যি তাই….

কিন্তু মনে রেখো, আজ রাতেই আমি তাকে হত্যা করবো। যে বাপুকে গ্রেপ্তারের জন্য উন্মাদ, যে বাপুর শরীরে গুলীবিদ্ধ করে তাকে আহত করেছিলো, আর তুমি কিনা তাকে দয়া দেখাতে গিয়েছিলে?

নূরীর মাথাটা যেন বনবন করে ঘুরে উঠলো, পুত্রের কথাটা তার কানের কাছে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো...আজ রাতেই আমি তাকে হত্যা করবো আজ রাতেই আমি তাকে হত্যা করবো...

নূরী পুত্রের দিকে না তাকিয়ে দ্রুত তার পাশ কেটে চলে গেলো।

জাভেদ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ, তারপর চলে গেলো।

নূরী সোজা বনহুরের বিশ্রামাগারে প্রবেশ করে চেপে ধরলো তার জামার আস্তিন, বললো–জাভেদ যাকে বন্দী করে এনেছে সে তোমার কে তা তো তুমি জানো, তবু কেন নীরব আছো?

জাভেদ যা করছে তার উপর আমার করবার কিছু নেই।

সত্যি বলছো?

তাছাড়া উপায় কি বলে?

হুর, তোমার মুখের এ ধরনের জবাব শুনবো ভাবতে পারিনি। একটু থেমে বললো নূরী–তোমার এক সন্তান অপর এক সন্তানের হাতে নিহত হোক, এই তুমি চাও?

নূরী!

হা। জাভেদ বলেছে সে তাকে আজ রাতে হত্যা করবে।

বনহুর শয্যায় অর্ধশায়িত অবস্থায় ছিলো, এবার শয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারী করতে শুরু করলো, মুখমন্ডলে একটা দীপ্তভাব ফুটে উঠেছে যেন।

নূরী বললো–তুমি নূরকে উদ্ধার করো।

আমি নিরুপায়।

সেকি!

হাঁ, আমি পারবো না তাকে জাভেদের কাছ থেকে মুক্ত করতে।

সত্যি বলছো হুর

হাঁ, সত্যি বলছি।

বেশ, আমি তোমাকে আর অনুরোধ করবো না। কথাটা বলে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেলো নূরী।

বনহুরের ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠলো ক্ষীণ হাসির রেখা।

নূরী ততক্ষণে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে।

বনহুর পুনরায় শয্যায় বালিশে হেলান দিয়ে সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করলো।

*

গভীর রাতে একটা শব্দ হলো।

নূর সজাগ হয়ে কান পাতলো, তবে কি তাকে হত্যা করার জন্য দস্যু দলের কেউ কারাকক্ষে প্রবেশ করলো। আজ রাতে তাকে হত্যা করা হবে, একথা নূরকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তাকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। নূর মৃত্যু ভয়ে ভীত না হলেও গভীর চিন্তা করছিলো কিভাবে সে এই দস্যু দলের কবল থেকে রক্ষা পেতে পারে। তার জুতোর গোড়ালির মধ্যে অদ্ভুত এক ক্ষুদে ওয়্যারলেস মেশিন, এখানে বন্দী হবার পর নূর পুলিশমহলকে জানিয়ে দিয়েছিলো সে দস্যু বনহুরের বন্দীশালায় বন্দী। কিন্তু সে পথের নির্দেশ দিতে পারলো না। কারণ তাকে গ্রেপ্তারের পর হাত পিছমোড়া করে বেঁধে দুচোখ কালো কাপড়ে ঢেকে আস্তানায় আনা হয়েছে। তা ছাড়া তাকে অশ্বপৃষ্ঠে তুলে আনা হয়েছে, কাজেই সে বুঝতেই পারেনি তাকে কোথায় আনা হয়েছে।

পুলিশমহল নূরের নিরুদ্দেশ নিয়ে ভীষণ চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলো। হঠাৎ কোথায় গেলো সে, কেউ জানে না।

বিশেষ করে পুলিশ প্রহরীরাও ঠিকভাবে জানতে পারেনি রাতের অন্ধকারে নুরুজ্জামান চৌধুরী কোথায় গেলেন। তবে দু একজন প্রহরী কিছুটা সন্ধান জানতে পেরেছিলো যারা নূরকে রাতের অন্ধকারে অশ্বপদশব্দ লক্ষ্য করে গাড়ি চালাতে দেখেছে।

কিন্তু সঠিক কেউ কিছু বলতে পারেনি।

হঠাৎ ওয়্যারলেসে নূরের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে পুলিশমহল বুঝতে পারলো নুরুজ্জামান চৌধুরী যেখানেই থাক তিনি জীবিত আছেন এবং তারা আরও বুঝতে পারলেন দস্যু বনহুরের কবলে পড়েছেন।

সংবাদটা ছড়িয়ে পড়লো সমস্ত কান্দাই শহরে।

এমন কি সংবাদটা পৌঁছে গেলো চৌধুরীবাড়িতেও। চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন চৌধুরীবাড়ির সবাই সরকার সাহেব যখন এসে বললেন কাল রাত থেকে নূরকে তার বাসভবনে পাওয়া যাচ্ছে না, তখন মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়েছিলো সবার। মনিরা তো থ হয়ে গিয়েছিলো। তার গলা দিয়ে কথা বের হচ্ছিলো না।

মরিয়ম বেগম চিৎকার করে কেঁদে উঠেছিলেন, তার ধারণা নূরকে শত্রুগণ হত্যা করে ফেলেছে, আর তাকে কোনোদিন খুঁজে পাবেন না। তিনি বারবার সরকার সাহেবকে ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করছিলেন–আপনি কি ঠিক জানেন নুর সত্যি তার বাসভবনে নেই।

হা বেগম সাহেবা, আমি নিজে গিয়ে স্বচক্ষে সব দেখে এসেছি। নূরকে কোথাও খুঁজে পাইনি। তবে গ্যারেজে তার গাড়িখানাও নেই। আমরা নিঃসন্দেহ হয়েছি যে নূর যেখানেই যাক, সে তার গাড়ি নিয়ে গেছে।

মনিরা এবং মরিয়ম বেগম এতে মোটেই আশ্বস্ত হননি বরং আরও বেশি চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।

গাড়ি নিয়ে রাতের বেলায় সে গেলো কোথায়?

বারবার পুলিশ অফিসে টেলিফোন করে জানতে পারেননি কিছু, নূরের সন্ধান দিতে পারেননি কেউ।

সংবাদ শুনে শংকর রাও তার গোপন স্থান থেকে বেরিয়ে এসেছেন। তার সতর্কতার অন্ত নেই, তিনি অতি কৌশলে কান্দাই পুলিশ অফিস থেকে বনহুরের সম্বন্ধে রিপোর্টগুলো সরিয়ে ফেলেছেন। যেন দস্যু বনহুরকে তারই পুত্র দ্বারা শায়েস্তা করতে পারেন।

শংকর রাওকে দস্যু বনহুর বেশ নাকানি চুবানি খাইয়ে ছেড়েছে তাই তার এত রাগ, তাকে কাবু না করা পর্যন্ত তাঁর স্বস্তি নেই।

নুর জন্মাবার পূর্ব হতে কান্দাই পুলিশ বাহিনী বনহুরের সম্বন্ধে সব অবগত আছেন বটে কিন্তু সব পুলিশ অফিসারই তো চিরদিন এক জায়গায় স্থায়ী হয়ে থাকেন না। বদলীর চাকরি, তাই এক আসেন এক চলে যান। তবে পুলিশ অফিসে ডায়রীতে ঘটনাগুলো লিখা হয়ে থাকে। শংকর রাও সেকালের দক্ষ গোয়েন্দা তিনি মিঃ জাফরীর সঙ্গে কাজ করেছেন দীর্ঘকাল। দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারের জন্য নানা উপায় অবলম্বন করেছিলেন এবং কয়েক বার বনহুরকে গ্রেপ্তারও করেছিলেন কিন্তু আটক করে রাখতে পারেননি তারা তাকে।

একজন দস্যুর নিকটে পুলিশ প্রধানদের পরাজয় সত্যি লজ্জাকর, তাই পুলিশপ্রধান মিঃ আহমদ সরে পড়েছেন, তার সঙ্গে সরে পড়েছিলেন অনেকে।

মিঃ জাফরী বৃদ্ধ বয়সেও ছেড়ে দিলেন না। তিনিই একমাত্র প্রধান ছিলেন যিনি দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারের শপথ গ্রহণ করে সুদীর্ঘ সময় কান্দাই অবস্থান করেছেন। তবে মাঝে মাঝে তিনি বাইরেও গেছেন হয়তো বা কয়েক মাস অথবা বছরের জন্য, আবার তিনি ফিরে এসেছেন কান্দাই শহরে।

বনহুর তাকেই শুধু নয়, কান্দাই পুলিশবাহিনীকে নানাভাবে নাকানি চুবানি খাইয়ে ছেড়েছে, তাই শংকর রাও শপথ গ্রহণ করেছেন তিনি বনহুকে দেখে নেবেন এবং সেই উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি সুদীর্ঘ কাল ধরে বনহুরকে গ্রেপ্তারের জন্য নানা ধরনের কৌশল অবলম্বন করে চলেছেন।

মিঃ জাফরী ছিলেন তার পরামর্শদাতা এবং সঙ্গী বলা চলে। তিনি বহুকাল ধরে বনহুরকে গ্রেপ্তারে উৎসাহী ছিলেন। হঠাৎ তার মধ্যে এলো পরিবর্তন। দস্যু বনহুরের মহত্বের কাছে হলো তার পরাজয়।

যিনি দস্যু বনহুরের নামে উন্মত্ত ছিলেন, যার শপথ ছিলো দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার এবং তাকে শায়েস্তা করা, কিন্তু সে দক্ষ পুলিশ প্রধান গেলেন পাল্টে। তিনি দস্যু বনহুরকে বন্ধু বলে গ্রহণ করলেন এবং সরকারি চাকুরিতে ইস্তফা দিলেন।

মিঃ জাফরীর মন আজ বনহুরের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরপুর। তিনি বুঝতে পেরেছেন এমন হৃদয়বান পুরুষ পৃথিবীতে কমই আছে যাদের লোভ লালসা মোহ নেই। মিঃ জাফরী নিজে এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। তাই তিনি দস্যু বনহুরের পিছু ত্যাগ করে একজন স্বাভাবিক নাগরিকের মত জীবন যাপন করছেন।

কিন্তু মিঃ শংকর রাও দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার থেকে ক্ষান্ত হননি। একদিন তিনি যুবক ছিলেন, আজ তিনি বয়সের শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছেন তবু তার শপথ থেকে পিছপা হননি। আজও তিনি আত্মগোপন করে অত্যন্ত কৌশলে কাজ করছেন।

শংকর রাও জানতেন পুলিশ অফিস থেকে দস্যু বনহুরের আসল পরিচয় ডায়রীর খাতায় লিপিবদ্ধ করা ছিলো তা অতি সতর্কতার সঙ্গে সরিয়ে ফেলতে হবে, নাহলে তার সন্তান প্রখ্যাত ডিটেকটিভ নুরুজ্জামান চৌধুরীকে দিয়ে সঠিকভাবে কাজ করানো সম্ভব হবে না।

অবশ্য মিঃ শংকর রাওকে এ ব্যাপারে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছে।

শংকর রাও অতি সাবধানে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেছেন এবং সে কারণেই আজও প্রখ্যাত ডিটেকটিভ হয়েও নুরুজ্জামান জানতে পারেনি দস্যু বনহুরের সঙ্গে চৌধুরী বাড়ির কি সম্বন্ধ! অবশ্য পুলিশ মহলে এখন যে সব কর্মকর্তা রয়েছেন তারা সবাই নতুন, কাজেই অনেকে জানেন না দস্যু বনহুরের সঙ্গে চৌধুরীর বাড়ির কি সম্পর্ক।

নুরুজ্জামান যে চৌধুরীবাড়ির ছেলে এটা সবাই জানেন। এতে কারও মনে কোনো সন্দেহের উদ্বেগ হয়নি। তবে পুলিশমহলের প্রখ্যাত পুলিশ সুপার মিঃ হারুন জানেন। তিনিও কান্দাই ছেড়ে এখন অনেক দুরদেশে রয়েছেন।

ইদানীং পুলিশমহল চৌধুরীবাড়ির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা থেকে ক্ষান্ত হয়েছেন, কারণ সুদীর্ঘ সময় দস্যু বনহুরের কোনো সন্ধান ছিলো না। তবে নূরকে সেদিন জানানো হয়েছিলো বনহুর চৌধুরী বাড়িতে হানা দেবে। এবং সে কারণেই নূর পুলিশবাহিনী নিয়ে প্রস্তুত ছিলো চৌধুরী বাড়ির চারপাশে।

নুরুজ্জামান বুদ্ধিমান বটে তাই বলে সে এখনও শংকর রাওয়ের মত ধূর্ত গোয়েন্দা হতে পারেনি।

মিঃ জাফরীর নিকটে পুলিশবাহিনী আর কোনো সহায়তা পান না, কারণ মিঃ জাফরী তখন বনহুরকে গ্রেপ্তার থেকে সম্পূর্ণ বিরক্ত আছেন, কারণ বনহুর তার জীবনরক্ষাকারীই নয়, বনহুরের মহত্ত্ব তাকে মুগ্ধ বিস্মিত করেছে।

আজ মিঃ জাফরী তাই দক্ষ পুলিশপ্রধান হয়েও চাকরি ত্যাগ করে স্বাভাবিক জীবন যাপন করছেন।

বনহুর কান্দাই ফিরেই একদিন দেখা করেছে মিঃ জাফরীর সঙ্গে। বনহুর জাফরীর বন্ধু বনে গেছে এখন। যে কোনো মুহূর্তে বনহুর মিঃ জাফরীর সঙ্গে দেখা করে আসে।

রহমান বন্দী হবার পর পুলিশমহল যখন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে জানতে পারলো সে দস্যু বনহুর নয়, এমন কি মিঃ জাফরীকেও হাঙ্গেরী কারাগারে আনা হয়েছিলো সত্যি সে বনহুর কিনা সঠিক প্রমাণ করার জন্য।

গভীরভাবে তদন্ত করে যখন পুলিশ মহল জানতে পারলো বন্দী ব্যক্তি বনহুর নয় তখন রহমানকে মুক্ত করে দিয়েছিলো।

রহমান মুক্তিলাভ করেই সবার অলক্ষ্যে দেখা করতে গিয়েছিলো চৌধুরীবাড়ি মনিরার সঙ্গে কিন্তু সাক্ষাৎলাভের সুযোগ ঘটেনি, ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিলো রহমান কান্দাই শহরের আস্তানায়। তারপর এক সময় পৌঁছে গিয়েছিলো কান্দাই জঙ্গলে তাদের আসল আস্তানায়।

যদিও রহমান তার একটা হাত হারিয়ে ছিলো তবু সে দুর্বল না হয়ে উঠেছিলো আরও দুর্দান্ত ভয়ংকর। পূর্বের চেয়ে রাগটা আরও বেড়ে গিয়েছিলো তার চরমভাবে। পুলিশমহল থেকে ছাড়া পেয়ে সে নিজকে ধন্য মনে করেনি, বরং সে নিজকে করুণার পাত্র মনে করেছিলো এবং সে কারণেই রহমান পুলিশের প্রতি আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলো।

এমন দিনে জাভেদ বন্দী করে নিয়ে এলো নুরুজ্জামান চৌধুরী নূরকে।

রহমান নূরকে চিনলেও নূর রহমানকে চিনতে পারলো না। কারণ তার মুখেও ছিলো আবরণ। নিচের অংশ ছিলো পাগড়ির আঁচলে ঢাকা।

নূরী যখন খাবার নিয়ে বন্দীশালায় প্রবেশ করছিলো তখন আড়াল থেকে রহমান সব লক্ষ্য করছিলো। রহমান জানে একমাত্র নূরীই তাকে খাওয়াতে পারবে।

নূরী কারাকক্ষ থেকে বেরিয়ে যাবার পর রহমানও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ঐ স্থান ত্যাগ করেছিলো।

নূর ভাবছিলো কে এই মহিলা যার হৃদয়ে এত দয়ামায়া। নিশ্চয়ই এই দস্যুদলের লোক সে……নানা চিন্তার মধ্যে নূর এক সময় তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলো।

হঠাৎ শব্দ কানে যেতেই সজাগ হয়ে সোজা হয়ে বসলো এবং দ্রুত হস্তে সে জুতোর গোড়ালির মধ্য হতে ক্ষুদে ওয়্যারলেসটা বের করে পুলিশমহলকে জানিয়ে দিলো। রাত এখন কত জানি না, আমার কারাকক্ষে দরজা খোলার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। হয়তো আমাকে ও হত্যা করার জন্য কারাকক্ষে প্রবেশ করলো। হয়তো মৃত্যুকেই সাদরে বরণ করে নিতে হবে। কিন্তু যতক্ষণ আমার দেহে প্রাণ থাকে ততক্ষণ আমি নিজকে রক্ষার চেষ্টা করবো–তবে যদি নিজকে রক্ষা করতে না পারি তাহলে–আমার–মাকে

কথা শেষ করতে পারলো না নূর, অন্ধকারে কে যেন তার সম্মুখে এসে দাঁড়ালো।

নূর দ্রুত জুতো পরে নিলো পায়ে।

ঠিক ঐ মুহূর্তে সেই সুন্দর মিষ্ট কণ্ঠস্বর–নূর, এক মুহূর্ত বিলম্ব করোনা, বেরিয়ে যাও। আমি তোমাকে মুক্ত করে দিলাম।

সেই নারীকণ্ঠ যে তাকে জোর করে খাবার খাইয়ে তবে ছেড়েছিলো। কে এই নারী যে তাকে গভীর রাতে কারাকক্ষ থেকে মুক্ত করে দিতে এসেছে…তারপর আমার নাম ধরে বলছে। তার নাম সে জানলে কি করে! কিন্তু সে প্রশ্নের জবাব কে দেবে।

বেশিক্ষণ ভাববার সময় নেই।

নূর উঠে দাঁড়ালো।

আধো অন্ধকারে তার সম্মুখে দন্ডায়মান নারীমূর্তি। যদিও তাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না তবু নূর বেশ বুঝতে পারছে নারীমূর্তি অন্য কেউ নয় যে মহিলা তাকে খাবার খাইয়ে রেখে গিয়েছিলো এ সেই মহিলা। ওকে বিশ্বাস করতে পারলো নূর।

নারীমূর্তি যে নূরী তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

নূর উঠে দাঁড়াতেই নারীমর্তি বললো–তোমার চোখে কালো কাপড় বেঁধে দেবো।

নূর বিনা দ্বিধায় মাথাটা নিচু করলো নূরীর সম্মুখে।

কালো রুমালখানা নূরের চোখে বাঁধতে গিয়ে দুচোখ ছাপিয়ে পানি এলো নূরীর। একদিন ছোটশিশু নূরকে বুকে চেপে নিজের দুঃখব্যথা ভুলেছিলো, নূরকে সে নিজ সন্তানের মত আদরযত্ন করেছিলো। এক মুহূর্ত নূরকে না দেখলে তার মন অস্থির হয়ে উঠতো। সেই নুর আজ কত বড় হয়েছে....

নূরী ওর চোখে রুমাল বাঁধা শেষ করে হাতের পিঠে নিজের চোখের পানি মুছে নিলো, তারপর বললো–আমার হাত ধরো।

নূর হাত বাড়িয়ে দিলো।

নূর শুনতে পেলো পেছনে কারাকক্ষের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হলো।

নূরীর হাত ধরে এগিয়ে যাচ্ছে তরুণ ডিটেকটিভ নূরুজ্জামান চৌধুরী। কিছুক্ষণ পূর্বেও মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে প্রতীক্ষা করছিলো সে। যদিও মৃত্যুকে নূর সানন্দে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ছিলোনা তবুও মৃত্যু আসতে পারে তাই তাকে কতকটা সজাগ হতে হয়েছিলো।

নুর কোনো প্রতিবাদ করে না, সে নরীর হাত ধরে বেরিয়ে আসে বাইরে। একেবারে সুরঙ্গপথ দিয়ে অন্য একদিকে।

নূরীর কথামত সুরঙ্গমুখে অপেক্ষা করছিলো দুটি অশ্ব। দুজন অনুচর অশ্বের লাগাম ধরে রেখেছিলো।

অশ্ব দুটির একটিতে নূর অপরটিতে উঠে বসলো নূরী।

তারপর বললো নূরী অনুচরদ্বয়কে–তোমরা সুড়ঙ্গমুখ বন্ধ করে ফিরে যাও। কেউ যেন জানতে না পারে আমরা এই পথে বেরিয়ে গেছি।

কুর্ণিশ জানিয়ে বললো অনুচরদ্বয়ের একজন–আচ্ছা রাণীজী!

অনুচরের কথাটা কানে গেলো নূরের, কিছুটা বিস্ময় ফুটে উঠলো তার চোখেমুখে কিন্তু চোখ দুটো কালো কাপড়ে বাধা থাকায় এবং মুখমন্ডল রাতের অন্ধকারে অস্পষ্ট হওয়া নূর তা দেখতে বা বুঝতে পারলো না।

নূরী অশ্বের লাগাম ধরে রাখলো। বললো–নূর, তোমাকে মুক্ত করে দিতে চলেছি। অহেতুক পালাতে বা কোনো চালাকি করতে যেও না, তাহলে বিপদে পড়বে!

বললো নূর–আগে বলো তুমি কে? আর কি করেই বা আমার নাম জানলে?

নূরী বললো–আজ নয়, আবার যদি কোনোদিন তোমার সঙ্গে দেখা হয় সেদিন সব কথা জানতে পারবে।

নূর আর কোনো প্রশ্ন করলো না। কারণ নূরীর কণ্ঠস্বরে এমন একটা তেজদীপ্ত ভাবছিলো যার জন্য নূরের বুঝতে বাকি রইলো না এর বেশি ওর কাছে আজ আর কিছু জানতে পারবে না।

বহু দূরে এসে পড়েছে তারা।

গভীর জঙ্গল পেরিয়ে এক নির্জন প্রান্তরে।

চারদিকে জনপ্রাণীর কোনো চিহ্ন নেই।

পূর্বাকাশ সবেমাত্র ফর্সা হতে চলেছে।

অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে দাঁড়ালো নূরী, তারপর নূরকে সে হাত বাড়িয়ে নামিয়ে নিলো।

খুলে দিলো ওর চোখের বাঁধন।

নূর ভোরের আলোতে স্পষ্ট দেখলো নূরীকে।

জমকালো পরিচ্ছদে আবৃত তার দেহ। শুধু মুখমন্ডল অনাবৃত। শুভ্র সুন্দর কোমল একটি মুখ সে মুখে মাতৃসুলভ ভাব ফুটে উঠেছে। উজ্জ্বল দীপ্ত দুটি চোখে মায়াভরা দৃষ্টি।

নূরের মন শ্রদ্ধায় নত হয়ে এলো, মনে তার প্রশ্ন–কে এই দয়াবতী রমণী?

নূরকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে বললো নূরী–যাও আর বিলম্ব করো না। তুমি চলে যাও নূর…হাঁ, এই অশ্বটি তুমি নিয়ে যাও কিন্তু শহরের বাইরে ওকে রেখে তুমি চলে যেও।

নূর ভাবছে এ একটি নারী–একে কাবু করা মোটেই কঠিন নয়। বরং বন্দী করে সে নিয়ে যেতে পারে। এক্ষুণি জুতোর গোড়ালি খুলে সংবাদ দিতে পারে পুলিশ অফিসে। পুলিশবাহিনী সংবাদ পাবার সঙ্গে সঙ্গে এসে পড়বে এবং এই মহিলাকে বন্দী করে নিয়ে যাবে পুলিশ অফিসে। এর মুখ থেকেই বের করে নেওয়া যেতে পারে বনহুরের আস্তানার পথের সন্ধান…

নূরী হেসে বললো–জানি তুমি কি ভাবছো। কিন্তু তা কিছুতেই সম্ভব নয়, কারণ তুমি জানোনা বনহুরের আস্তানা খুঁজে বের করা কারও সাধ্য নয়। অহেতুক প্রাণ ক্ষয় হবে।

নূর অবাক হলো, আশ্চর্য মহিলা তার অন্তরের কথা সে কি করে জানতে পারলো। আর বিলম্ব না করে অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসলো সে।

অশ্বপৃষ্ঠে বসে একবার সে ফিরে তাকালো নূরীর দিকে।

নুরীর দুচোখ পানিতে ঝাপসা হয়ে এসেছে, তবু সে নির্বাক নয়নে তাকিয়ে আছে ওর দিকে! যেন কতদিনের হারানো রত্নকে সে ফিরে পেয়েছিলো, আবার হারাতে যাচ্ছে।

নূর দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলো।

নূরী চেপে বসলো তার অশ্বপৃষ্ঠে।

আস্তানায় প্রবেশ করতেই জাভেদ পথ আগলে দাঁড়ালো।

নূরী চমকে মুখ তুললো।

জাভেদ কঠিন কণ্ঠে বললো–আম্মু, তুমি তাহলে

হাঁ, আমিই নূরকে মুক্ত করে দিয়ে এলাম।

আম্মু!

হাঁ জাভেদ।

জাভেদের চোখ দুটো দিয়ে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হলো। সে ভীষণ হুঙ্কার ছেড়ে বললো–আম্মু, তুমি এ কাজ করতে গেলে কেন? আর ওর নামই বা তুমি জানলে কেমন করে?

জাভেদ পথ ছাড়ো, আমি কোনো কথার জবাব দেবো না।

দিতে হবে।

না।

আম্মু ও আমাদের চরম শত্রু।

জানি।

তবু তুমি?

হাঁ।

শুধু হাঁ বলো না, জবাব দাও।

দেবো না।

আম্মু, তুমি আমার জন্মদাত্রী মা, তাই এখনও তুমি জীবিত আছে, নইলে…

রিভলভার চেপে ধরলো জাভেদ নুরীর বুকে।

এমন সময় পেছনে এসে দাঁড়ালো বনহুর, বললো–জাভেদ!

না, আমি জানতে চাই কেন আম্মু আমাদের শত্রুকে নিজের হাতে মুক্ত করে দিয়ে এলো।

জবাব আমি দেবো। বললো বনহুর।

এবার জাভেদ মায়ের বুক থেকে রিভলভার সরিয়ে নিয়ে ফিরে তাকালো বনহুরের মুখের দিকে।

নূরী সন্তানের দিকে একবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আস্তানার অভ্যন্তরে চলে গেলো।

জাভেদ বললো–বাপু, তুমি জানো ঐ ছোঁকড়া ডিটেকটিভ কত বড় শয়তান

না জাভেদ, সে শয়তান নয়। বলতে পারো ভয়ংকর অথবা দুর্দান্ত। আমি জানি সে দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারের জন্য উন্মাদ হয়ে উঠেছে...

এত জেনেও তুমি আম্মুকে এ ব্যাপারে কিছু বললে না?

বলে কোনো ফল হবে না।

এ তুমি কি বলছো বাপু?

হাঁ, তোমার আম্মু যা করেছে তা মন্দ করেনি।

তুমিও কি তাহলে ...

তরুণ ডিটেকটিভ, তাকে সুযোগ দিতে হবে বৈকি...

বাপু!

নতুন সূর্যকে উদয় হতে দাও জাভেদ।

নতুন সূর্য! কে নতুন? ঐ গোয়েন্দা বাদমাইসটা? যার নাম শুনলে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বালা করে। আজ রাতে ওকে হত্যা করবো ভেবেছিলাম।

জাভেদ, মানুষ হত্যা করা মহাপাপ।

বাপু, তোমার মুখে এ কথা?

কেন, আমার মুখে এ কথা শুনে অবাক হচ্ছিস কেন?

তুমি মানুষ হত্যা করোনি বলতে চাও?

গম্ভীর কণ্ঠে বললো বনহুর–মানুষ আমি হত্যা করিনি কোনোদিন।

বাপু, জানতাম তুমি দস্যু হলেও মিথ্যা কথা বলোনা কোনোদিন।

হাঁ–আমি আজও মিথ্যা কথা বলিনি।

বাপু, আজ পর্যন্ত কত শত মানুষকে তুমি হত্যা করেছে, তা আমার অজানা নেই।

জাভেদ, তুমি যাদের মানুষ বলে হিসেবের তালিকায় সন্ধান করছে তারা মানুষ নয়।

মানুষ নয়?

না।

তবে কি তারা?

পশু!

পশু?

হুঁ।

বাপু, তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।

শোনো জাভেদ, আমি যাদের হত্যা করেছি তারা অমানুষ জানোয়ারের চেয়েও হীন জঘন্য। দাতে দাঁত পিষলো বনহুর।

জাভেদ তাকিয়ে আছে বনহুরের মুখের দিকে।

বললো বনহুর পুনরায়–মানুষের রূপ নিয়ে যে সব মানুষ নিরীহ জনগণের বুকের রক্ত চুষে খায় আমি সেইসব অমানুষকে হত্যা করেছি। যাকে তুমি আজ হত্যা করতে যাচ্ছিলে সে এইসব অমানুষের লিস্টে পড়ে না।

বাপু, তুমি যাই বলল আমি ঐ ডিটেকটিভটাকে দেখে নেবো। কেমন গোয়েন্দা সে…কথাটা বলে দ্রুত চলে গেলো জাভেদ আস্তানার বাইরে।

জাভেদের অশ্ব অদূরে বাঁধা ছিলো।

জাভেদ যেমন তার অশ্বপৃষ্ঠে চাপতে যাবে, অমনি পেছন থেকে কেউ তার পিঠে একটা ফল ছুঁড়ে মারলো।

চমকে ফিরে তাকালো জাভেদ।

খিল খিল করে হেসে উঠলো ফুল্লরা। তার কোচরে একরাশ বন্য ফল। একটা ফল সে খেতে খেতে ছুঁড়ে মেরেছিলো জাভেদকে লক্ষ্য করে।

জাভেদ ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিয়ে তাকালো।

ফুল্লরা বললো চলে যাচ্ছিস জাভেদ

জাভেদ রাগত কণ্ঠে বললো–যাবোনা তবে কি থাকবে?

কেন, এখানে থাকতে ইচ্ছা হয় না তোর?

কথাটা বলে ফুল্লরা জাভেদের পাশে এসে দাঁড়ালো।

জাভেদ, কোনো জবাব না দিয়েই অশ্বপৃষ্ঠে উঠতে যাচ্ছিলো, ফুল্লরা ওর জামার পেছন অংশ টেনে ধরে বললো–জবাব না দিয়ে তোকে যেতে দেবো না জাভেদ।

বাধা পেয়ে জাভেদ আরও রেগে গেলো, এক ঝটকায় ওর হাতের মুঠা থেকে জামাটা ছাড়িয়ে নিয়ে বললো–তোদের চেয়ে আশা আম্মু অনেক ভাল।

ওঃ সব সময় আশা আম্মু! যা যা দেখবো কতদিন ওখানে থাকতে পারিস? তোর জন্য মোটেই আর ভাবি না।

না ভাবলি তো আমার বয়েই গেলো। কথাটা বলে জাভেদ অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসলো।

ফুল্লরা বললো–ফল নিবি না?

বললো জাভেদ–তুই খা! তারপর অশ্ব নিয়ে চলে গেলো সে।

ফুল্লরা থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ, তারপর পায়ের মলে ঝংকার তুলে চলে গেলো।

*

মিঃ নুরুজ্জামান ফিরে এসেছেন, এ সংবাদ মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়লো গোটা কান্দাই শহরে, যেমন তার নিরুদ্দেশ ব্যাপার ছড়িয়ে পড়েছিলো।

পুলিশমহল থেকে সবাই এলেন তার সঙ্গে দেখা করার জন্য। এমন কি মিঃ শংকর রাও স্বয়ং এলেন নুরুজ্জামান চৌধুরীর বাসায়।

সবাই বিস্ময় নিয়ে এসেছেন কি করে ফিরে এলো সে দস্যু বনহুরের আস্তানা থেকে–এই তাদের প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা।

মিঃ শংকর রাও এসে বসলেন কিন্তু তিনি কথা বলার সুযোগ পাচ্ছেন না। নূরের চারপাশে ঘিরে আছেন কান্দাইয়ের সাংবাদিকগণ।

তারা নানা জনে নানা প্রশ্ন করে চলেছেন।

নূর শান্তভাবে জবাব দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু তাদের প্রশ্নের জবাব ছাড়া একটা কোনো কথা সে। বেশি বলছে না। পাশে বসে মিঃ শংকর রাও শুনে যাচ্ছিলো।

মিঃ শংকর রাও অতি চতুর ব্যক্তি, তিনি ভালভাবে নূরের কথাগুলো অনুধাবন করছিলেন। নূর কি জানতে পেরেছে বনহুর তার কে? একটা সন্দেহ ছিলো মিঃ শংকর রাওয়ের মনে, যখন সাংবাদিকদের সঙ্গে নূরের আলাপ হচ্ছিলো তখন

তিনি তার কথাবার্তা থেকে বুঝতে পারলেন নূর মোটেই জানতে পারেনি বনহুরের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক।

হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন মিঃ শংকর রাও।

বয়স তার কম হয়নি, বিশ বছর ধরে শংকর রাও সাধনা চালিয়ে যাচ্ছেন দস্যু বনহুরকে তিনি গ্রেপ্তার করবেন কিন্তু আজও সফলকাম হননি।

তখন দস্যু বনহুর তরুণ ছিলো।

বয়স ছিলো তার বাইশ অথবা চব্বিশ! এই বয়সেই বনহুর বিশ্ববিখ্যাত দস্যু বনে গিয়েছিলো, পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিলো তার নাম। আতঙ্কে প্রকম্পিত হয়েছিলো অসৎ ব্যক্তিদের হৃদয়।

আজও বনহুরের নামে শিউরে উঠে দেশের এবং জনগণের অমঙ্গল সাধনে সচেষ্ট স্বার্থান্বেষী দল।

শংকর রাও সিগারেটের পর সিগারেট নিঃশেষ করে চলেছেন। তার চক্ষুদ্বয় স্থির হয়ে আছে। নূরের মুখের দিকে।

এক সময় সাংবাদিকমহল নূরকে ছুটি দিয়ে চলে গেলো।

মুক্তি পেলো নূর।

মিঃ শংকর রাও এবার হাতের অর্ধদগ্ধ সিগারেটটা এ্যাসূট্রের মধ্যে খুঁজে রেখে সোজা হয়ে বসলেন। তারপর বললেন–মিঃ চৌধুরী।

বলুন?

মিঃ শংকর রাও নূরকে মিঃ চৌধুরী বলে ডাকতেন।

মিঃ শংকর রাওকে সোজা হয়ে বসতে দেখে, নূর বুঝে নিয়েছিলো সাংবাদিকদের কাছ থেকে সে নিষ্কৃতি পেলেও মিঃ শংকর রাওয়ের কাছ থেকে মুক্তি পায়নি এখনও।

নূরের মনটা অবশ্য ছটফট করছিলো কখন সে মায়ের কাছে যাবে। মা ও দাদীমাকে না দেখা পর্যন্ত যেন স্বস্তি ছিলো না তার।

তবু মনের গোপন কথা মনে চেপে সবার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলো। সে নিজেই বিস্মিত, দস্যু বনহুরের বন্দীশালা থেকে কি করে মুক্ত হলো?

সাংবাদিকমহল বিদায় নিতেই শংকর রাও বললেন–মিঃ চৌধুরী, এবার আমি আপনাকে একটি প্রশ্ন করবো যদিও সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে আপনি সব কথাই ব্যক্ত করেছেন।

বলুন মিঃ রাও?

নূরের কণ্ঠস্বরে শংকর রাও যেন চমকে উঠলেন। এই কণ্ঠ যেন তিনি বিশ বছর পূর্বেও শুনেছিলেন। মিঃ রাও মিঃ রাও মিঃ রাও একদিন গভীর রাতে শংকর রাও তাঁর বাংলোয় ক্রুদ্ধ ভাবে পায়চারী করছিলো। তার মাথার রগগুলো যেন টনটন্ করছিলো সেদিন, কারণ দস্যু বনহুর তাকে কৌশলে বাক্সে বন্দী করে তারই বাসায় মাল হিসেবে পাঠিয়ে দিয়েছিলো। মিসেস রাও মনে করেছিলেন, হয়তো বা তার স্বামী নতুন বাক্সটা কিনে কোনো সৌখিন জিনিস সহ বাসায় পাঠিয়েছেন।

মিসেস রাও চাকরকে বললেন–বাক্সটা খুলে তার মধ্যে কি জিনিসপত্র আছে ঝটপট বের কর।

বেগম সাহেবার নির্দেশ পেয়ে বাড়ির দারোয়ান এবং বয়–বাবুর্চি, চাকর–বাকর সবাই এসে বাক্সটা ঘিরে ধরলো, না জানি সাহেব এত বড় বাক্সটার মধ্যে কি জিনিস কিনে পাঠিয়েছেন।

বেগম সাহেবার মনে আনন্দ ধরছে না, এত বড় বাক্স। তারপর ভারী সুন্দর কিন্তু বাক্সটা। বেগম সাহেবার যেন বিলম্ব সইছে না।

তাড়াতাড়ি বাক্সটা খুলে ফেলার জন্য বললেন মিসেস রাও।

বাক্সটা এবার খুলে ফেলা হলো।

সঙ্গে সঙ্গে মিসেস রাও আর্তনাদ করে উঠলেন–ওগো, তোমার একি অবস্থা?

সবাই অবাক হয়ে দেখলো নতুন বাক্সটার মধ্যে হাত-পা–মুখ বাধা অবস্থায় পড়ে রয়েছেন মিঃ শংকর রাও।

শংকর রাও কিন্তু সংজ্ঞা হারাননি!

তাঁর হাত-পা এবং মুখের বাধন খুলে দিতেই তিনি চিৎকার করে বললেন–আমি শপথ করছি দস্যু বনহুরকে আমি শায়েস্তা না করে ছাড়বো না কিন্তু মুখে শপথ গ্রহণ করলেও কাজে সক্ষম হলেন না।

সেদিন সমস্ত রাত তিনি ঘুমাতে পারলেন না–এতবড় অপমান! স্ত্রী চাকর–বাকরের সামনে মুখ দেখাতে লজ্জায় মাথা কাটা যেতো। খেতে বসেও খেতে পারতেন না। সমস্ত শরীরে যেন কেউ আগুন জ্বেলে দিয়েছিলো।

রাতে খোলা বারান্দায় পায়চারী করতেন।

রাগে গমগম করতো তার শরীর।

দস্যু বনহুরকে পেলে তাকে টুকরো টুকরো করে কেটে কুকুরকে দিয়ে খাইয়ে তবে ছাড়বেন, নাহলে তার শান্তি নেই। দাতে অধর দংশন করছিলেন আর পায়চারী করছিলেন, ঠিক এমন সময় কেউ যেন তার পেছনে এসে দাঁড়ালো। গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো–মিঃ রাও।

চমকে ফিরে তাকিয়ে থ হয়ে গিয়েছিলো।

স্বয়ং দস্যু বনহুর দাঁড়িয়ে তার পেছনে।

আজ শংকর রাও নূরের কণ্ঠস্বরে সেই সুরের প্রতিধ্বনি শুনতে পেলেন। হঠাৎ করে শংকর রাও চলে গেলেন অনেক পেছনে ফেলে আসা দিনে...

কি ভাবছেন মিঃ রাও?

তাড়াতাড়ি নিজকে সামলে নিয়ে বললেন–আমি বিস্মিত হচ্ছি মহিলাটি হঠাৎ আপনাকে এভাবে মুক্তি দিলো কেন?

আমি নিজেও একথা ভাবছি মিঃ রাও, কিন্তু কোনো সমাধান খুঁজে পাচ্ছি না।

আচ্ছা মিঃ চৌধুরী, মেয়েটাকে কি ঐ দলের বলে মনে হচ্ছিলো, না সেও কোনো বন্দিনী?

এক কথায় বোঝা যায় সে বন্দিনী বা বাইরের মহিলা নয়, কারণ তার কার্যকলাপে বোঝা যাচ্ছিলো সে ঐ দলের।

এমনও তো হতে পারে সে দস্যু বনহুরের বন্দিনী কিন্তু এখন সে প্রেমিকায় রূপান্তরিত হয়েছে?

সে কথা আমি সঠিকভাবে বলতে পারবো না। তবে বনহুরকে আমি যতটুকু দেখেছি তাতে মনে হয় সে এক ব্যক্তিত্বপূর্ণ মানুষ....

মিঃ রাও ভ্রুকুঞ্চিত করে বললেন–আপনি কতটুকুই বা তাকে দেখেছেন। তার আসল রূপ আপনি জানেন না।

আমি যতটুকু জানি তাতেই আমার যতটুকু মনে হচ্ছে তাই বলছি।

বনহুর যে একজন ভীষণ ভয়ংকর দস্যু এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।

আমিও না।

আচ্ছা মিঃ চৌধুরী, কোনোক্রমেই কি আপনি সেই পথ খুঁজে পাবেন না?

সম্ভব নয়, কারণ যে পথে আমাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে, সে পথ আমার অপরিচিত। আমি কতবার ঐ পথে কান্দাই জঙ্গলে শিকার করতে গেছি, কত পশুপাখি আমি শিকার করে এনেছি। কিন্তু কই এমন কোনো বা সুড়ঙ্গমুখ আমার নজরে পড়েনি। তবে হাঁ, আমি আবার সন্ধান নিয়ে দেখবো কোনো পথের খোঁজ পাই কিনা।

মিঃ চৌধুরী, আমি আপনাকে যথাসাধ্য সহায়তা করবো।

জানি আপনি আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী। আমাকে আপনি সব সময় সাহায্য করবেন তাও জানি। মিঃ রাও, আমি দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করতে চাই কিন্তু...

বলুন থামলেন কেন?

তার আস্তানার উপর আমি হামলা চালাতে চাই না, কারণ দস্যু বনহুরের আস্তানায় এমন একজন আছেন যিনি আমার মায়ের মত

শংকর রাও বললেন–আমরা হামলা চালালেও কোনো নারীর উপর মন্দ আচরণ করবো না।

শংকর রাও আরও কিছুক্ষণ আলাপ–আলোচনা করার পর সেদিনের মত বিদায় গ্রহণ করলেন।

*

নূর গাড়ি রেখে ছুটে গেলো সিঁড়ি বেয়ে উপরে।

এক একবারে দুতিনটে ধাপ অতিক্রম করে তার মায়ের ঘরে পৌঁছে গেলো।

মনিরা যখন নামায শেষ করে মোনাজাত করছিলো। পুত্রের ফিরে আসার সংবাদ তার কানে পৌঁছে গিয়েছিলো। তাই মনিরা প্রাণভরে খোদার নিকট শুকরিয়া করছিলো।

মোনাজাত শেষ করে পুত্রের হাতখানা গলার সঙ্গে চেপে ধরলো মনিরা–হঠাৎ এমন করে রাতের অন্ধকারে কোথাও গিয়েছিলে নূর?

দস্যু বনহুরের আস্তানায়।

মনিরা চমকে উঠলো না, কারণ সে শুনেছিলো সবকিছু। তাই বললো–সেখানে কেমন করে গেলি তুই?

সব বলবো। দাদী মা কই আম্মি?

এই তো আমি এসেছি। দাদুর পায়ের শব্দ কি আমার কানে যায়নি। জানতাম তুই আসবি।

তাই তো তোমরা যাওনি? নূর মায়ের কণ্ঠদেশ মুক্ত করে দিয়ে দাদীকে জড়িয়ে ধরলো তারপর দাদীর গালে গালটা স্পর্শ করে বললো–দাদীমা, জীবনে বেঁচে এসেছি নইলে আর কোনোদিন তোমাদের মুখ দেখতে পেতাম না।

বললেন মরিয়ম বেগম–দস্যু বনহুর বুঝি তোকে বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিলো।

সে বন্দী করে নিয়ে যায়নি, তারই এক অনুচর আমার বেডরুমে প্রবেশ করে আমাকে ভয় দেখাচ্ছিলো তাই আমি তাকে তাড়া করে নিয়ে গিয়েছিলাম।

বলিস কি নুর!

হাঁ দাদীমা।

বনহুরের অনুচর তোর বেডরুমে প্রবেশ করেছিলো। এত দুঃসাহস তার?

শুধু দুঃসাহস নয়, সে আমাকে অপমানসূচক কথা বলেছে। আম্মি, সে এক বিস্ময়কর কাহিনী!

মনিরা কিন্তু কোনো জবাব দিচ্ছিলো না।

মরিয়ম বেগম কথা বলছিলেন।

নূর বলছে–দাদীমা, বনহুরের বন্দীশালা মানে যমপুরী, বুঝলে?

জানি সেখানে তোর খুব কষ্ট হয়েছে। তোর উপরে তারা নির্যাতন চালিয়েছে…

না দাদী আম্মি, মোটেই তা নয়।

তার মানে?

মানে আমিই মুখে দেইনি কিছু।

কারণ?

কারন মরতে যখন হবেই তখন খেয়ে লাভ কি, তাই বন্দীশালায় বসে বসে মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করছিলাম।

তারপর?

ঐ রাতে আমাকে হত্যা করা হবে, এ কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছিলো।

সত্যি? দুচোখে বিস্ময় নিয়ে বললেন মরিয়ম বেগম।

মনিরা ওপাশে খাটের উপর বসে পড়ে শুনছে বৃদ্ধা শাশুড়ি এবং পুত্রের কথাগুলো।

বললো নূর–হাঁ, আমাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিলো। আমি সে কারণে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়েছিলাম।

বলিস কি নূর।

হ দাদী আম্মি…নূর কখনও দাদী আম্মি কখনও দাদীমা বলতো, কারণ দাদীমা ছিলো তার আদরের ডাক। কখনও কখনও দাদুও বলতো সে দাদীকে।

নূর এবার বলে চলে–আমি যখন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছি তখন কারাকক্ষের দরজা খুলে গেলো।

আমি সজাগ হয়ে উঠলাম।

কিন্তু দেখলাম খর্গ হাতে দস্যু বনহুর বা তার অনুচর নয়–এক নারীমূর্তি। সোজা হয়ে বসলাম, কিছুটা বিস্ময় নিয়ে দেখছি।

কারাকক্ষ বেশ অন্ধকার।

দূরে কোথাও মশাল জ্বলছে, তারই অস্পষ্ট আলোতে দেখলাম নারীমূর্তি একজন নয় দুজন। পেছনে যে তার হাতে খাবারের থালা।

নারীমূর্তি আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালো।

প্রথমে বললো–খাওনি কেন সারাদিন? নাও খেয়ে নাও নূর

জানো আম্মি, জানো দাদীমা, আমি একেবারে অবাক। দস্যু বনহুরের আস্তানার কেউ আমার নাম ধরে ডাকবে এ আমি ভাবতে পারিনি।

এবার মনিরা উঠে এলো পুত্রের পাশে।

নূর তখনও বলে চলেছে–মায়াভরা সে কণ্ঠ, তার স্নেহভরা আদেশ পালনে বাধ্য হলাম।

তুই খেলি ঐ বিষযুক্ত খাবার? বললো মনিরা।

না আম্মি, ঐ খাবার বিষযুক্ত ছিলো না। আম্মি, জানতাম অমন যার কণ্ঠস্বর সে কোনোদিন বিষ দিতে পারে না। সত্যি আমি তাকে মায়ের মত শ্রদ্ধা করি।

মনিরা রাগত কণ্ঠে বলে উঠে–না, তা হতে পারে না। দস্যুর আস্তানায় কোনো হৃদয়বান নারী—- থাকতে পারে না। নিশ্চয়ই সে কোনো মায়াবিনী….

আম্মি, তুমি ভুল বলছো। তোমার ছেলে এখন কচি খোকা নেই। সে মানুষ চিনতে ভুল করে না। সেই হৃদয়বান মহিলাই তো আমাকে সদ্য মৃত্যুর কবল থেকে উদ্ধার করেছে।

আমি বিশ্বাস করি না।

তুমি তাকে দেখোনি, দেখলে অবাক হতে। আমি তাকে অন্ধকার কারাকক্ষ ছাড়াও ভোরের আলোতে দেখেছি। সে এক মাতৃমুখ, যার তুলনা হয় না।

নূর!

আম্মি বিশ্বাস করো সে তোমার সন্তানের জীবনদায়িনী।

আমি বিশ্বাস করি না। সে রাক্ষসী, সে তার মায়াজাল বিস্তার করে সবাইকে গ্রাস করেছে।

আম্মি, তুমি তাকে চেনো?

না, আমি তাকে চিনবো কি করে? আমি তাকে চিনবো কেন? কথাগুলো শেষ করতে গিয়ে কণ্ঠস্বর বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে মনিরার।

বললেন মরিয়ম বেগম–নূর, তুই ওর কথায় কান দিনে দাদু। আমি জানি মেয়েদের হৃদয় সব সময় মায়াভরা হয়। দয়া স্নেহ মায়া মমতা নিয়েই যে নারীজনু…

তুমি ঠিক বলেছো দাদীমা, আমি জানি তোমরা নারীজাতি দয়াবতী আমি তাই শ্রদ্ধা করি নারীজাতিকে।

মনিরা কিছু বলতে যাচ্ছিলো মরিয়ম বেগম বললেন–বৌমা, তোমার সন্তানের যে জীবন বাঁচিয়েছে তার প্রতি তোমার করুণা থাকা দরকার।

রাতে নূর ঘুমাতে গিয়েও বারবার মা ও দাদীমার কথাগুলো নিয়েই ভাবছিলো, কেমন যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছিলো সবকিছু।

হঠাৎ আম্মি এমন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন কেন সেই নারীটির কথায়? আম্মি কি তাহলে চেনেন তাকে। না, তা কেমন করে হয়। দস্যু বনহুরের আস্তানায় সেই মহিলা আর তার মা কান্দাই শহরে। যে বাড়ির সঙ্গে কোনো সাধারণ বাড়ির বা ব্যক্তির কোনো সম্বন্ধ নেই।

অনেক কথা ভাবলো নুর কিন্তু কোনো সমাধান খুঁজে পেলো না।

কয়েক দিন কেটে গেলো।

নূর কিন্তু কোনো সময় ভুলতে পারেনি সেই মহিলার কথা। বনহুরের বন্দীশালায় যে তাকে মায়ের স্নেহে তার হৃদয়কে জয় করে নিয়েছিলো।

সেদিন সবার অলক্ষ্যে নুর তার গাড়ি নিয়ে হাজির হলো কান্দাই জঙ্গলের ধারে।

গাড়িখানা পথের ধারে রেখে সে কিছুটা জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করলো। নূরের পিঠে গুলীভরা, রাইফেল, সে শিকারের ছলনায় এসেছে। তার ইচ্ছা শিকারের চেয়ে সেই মাতৃহৃদয় সম্পন্না মহিলার দর্শন লাভ করা।

একটু একটু করে বেশ ভিতরে প্রবেশ করলো নূর। হঠাৎ তার নজরে পড়লো অদূরে একটা জলাশয়ে পানি পান করছে একটা হরিণ।

ভারী সুন্দর হরিণটা।

মুহূর্ত বিলম্ব না করে রাইফেল তুলে ধরে হরিণটাকে লক্ষ্য করে গুলী ছুড়লো। ঠিক তক্ষুণি হরিণটির দেহে এসে বিদ্ধ হলো একটা তীরফলক। ঠিক একই মুহূর্তে

হরিণটার দেহে গুলী এবং তীরফলক এসে বিদ্ধ হলো।

নূর আশ্চর্য হলো, তবু সে এগিয়ে চললো জালাশয়ের ধারে লুটিয়ে পড়া হরিণটার দিকে।

কয়েক পা অগ্রসর হতেই নূর চমকে উঠলো, সে দেখলো এক অশ্বারোহী তরুণী হাতে তার তীর–ধনু এগিয়ে আসছে হরিণটার দিকে।

নূর কিছু বলবার পূর্বেই নেমে দাঁড়ালো তরুণী তার অশ্ব থেকে।

নূর কিছু বলবার পূর্বেই বললো তরুণী–হরিণ আমি শিকার করেছি।

এবার নূর বললোনা হরিণ আমি শিকার করেছি।

তরুণী রাগতভাবে এগিয়ে গিয়ে হরিণটার পাশে দাঁড়িয়ে বললো–দেখছোনা হরিণের দেহে আমার নিক্ষিপ্ত তীর বিদ্ধ হয়ে আছে?

বললো নুর–তুমি ভাল করে লক্ষ্য করে দেখো হরিণটার দেহে রাইফেলের গুলী বিদ্ধ হয়েছে। আমার গুলী বিদ্ধ হওয়ার হরিণটার মৃত্যু ঘটেছে..

কিছুতেই তা মেনে নিতে পারি না, আমার তীর বিদ্ধ হওয়ায় হরিণটার মৃত্যু ঘটেছে…

নূর আর তরুণীর মধ্যে বেশ একটা ঝগড়া সৃষ্টি হলো।

বাধ্য হলো নূর তরুণীর কথা মেনে নিতে শেষ পর্যন্ত। কারণ তরুণী জোর করে হরিণটা তুলে নিলো তার অশ্বপৃষ্ঠে। একটা হরিণ নিয়ে গন্ডগোল করাটা সমীচীন মনে করলো না নূর।

কিন্তু মনে মনে সে নিজকে পরাজিত মনে করলো।

কে এই তরুণী যার কোনো পরিচয় সে জানে না, তার কাছে সে হার স্বীকার করে নেবে না, তা সে মেনে নেবে না।

বললো নূর–জানো ঐ হরিণটা আমি তোমাকে করুণা করে দিলাম তবে তোমার পরিচয় আমাকে দিতে হবে।

করুণার দান ফুল্লরা গ্রহণ করে না। ও হরিণ আমি শিকার করেছি, তাই আমি নিয়ে যাচ্ছি।

ও, তোমার নাম তাহলে ফুল্লরা! চমৎকার নামটা তোমার। বললো নূর।

তরুণী ততক্ষণে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসেছে।

নূর অবাক হয়ে দেখছে, কে এই তরুণী যার এত সাহস।

নূর যখন ওকে নিয়ে ভাবছে তখন তরুণী ফুল্লরা হরিণসহ তার অশ্ব নিয়ে গভীর জঙ্গলে অদৃশ্য হয়েছে।

নূর বিস্ময় নিয়ে তখনও তার চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে আছে। সত্যি এত সুন্দর তরুণী এর পূর্বে নূরের চোখে পড়েনি। উচ্ছল ঝরণার মত ওর গতি, সুন্দর কথা বলার ভঙ্গী, গোলাপী রং যেন উপচে পড়ছে তার দেহে। ডাগর ডাগর দুটি চোখ, উজ্জ্বল দীপ্ত।

ওকে নূরের বড় ভাল লাগলো।

ওর কাছে পরাজয় প্রথমে লজ্জাকর মনে হলেও পরের দিকে বেশ মধুময় মনে হলো।

নূর অন্যমনস্কভাবে ফিরে চললো তার গাড়ির দিকে।

*

বাসায় ফিরেও নূরের মন থেকে ফুল্লরার স্মৃতি মুছে গেলো না। নামটা সে বারবার উচ্চারণ করে মুখস্থ করে নিলো ফুল্লরা–

নতুন নাম…বড় মিষ্টি আর সুন্দর নাম। ঐ নামটা কেন যেন তার মনে গেঁথে গেলো।

একটা আকর্ষণ তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ঐ বনে যাবার জন্য মন তার চঞ্চল হয়ে উঠলো।

এক সপ্তাহ কেটে গেছে তারপর।

প্রতিদিন ভেবেছে আবার যাবে নূর কিন্তু কেন যেন সে যেতে পারে না, একটা বাধা তার পথ রোধ করে দাঁড়ায়। রাতে ঘুম হয় না, চোখ মুদলেই সেই অজ্ঞাত তরুণীর মুখখানা ভেসে উঠে চোখের সামনে। ঘাগড়া পরা একটা মেয়ে। পায়ে মল, হাতে বালা, কানে বালা। চুলগুলো দুটো বিনুনী করা, চোখে কাজলের রেখা, কপালে চন্দনের টিপ–আপন মনে বলে উঠে নূর–অপূর্ব!

শয্যা ভাল লাগলো না, গভীর রাতেই মন ছুটে যেতে চায় সেই জঙ্গলের ধারে।

পায়চারী করে।

সিগারেটের পর সিগারেট নিঃশেষ করে চলে নূর। এ্যাসট্রে ভর্তি হয়ে যায়।

সকালে বয় অবাক হয়, এত সিগারেট সাহেব পান করেছেন–তাহলে ঘুমান তিনি কখন?

সেদিন মনিরা এসে হাজির হলো পুত্রের বাসভবনে।

সপ্তাহে কমপক্ষে একদিন চৌধুরীবাড়িতে যায় দাদীমা ও আম্মির সঙ্গে দেখা করতে কিন্তু এক সপ্তাহ কেটে গেলো নূর যায়নি।

মনিরার মন সন্তানের জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে, তাই সে ছুটে এসেছে সন্তানের বাসায়।

হাজার হলেও মায়ের মন তো, হঠাৎ কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠেছিলো।

এসেই নূরকে সম্মুখে পেয়ে বললো–একবারও বাড়ির কথা মনে করলে না।

আম্মি মাফ করে দাও, বড় ব্যস্ত ছিলাম তাই।

আমি সব শুনেছি।

কি শুনেছো আম্মি? অবাক কণ্ঠে বললো নূর। মনে তার সন্দেহ জাগলো তবে কি তার আম্মি তার মনের কথা জেনে নিয়েছেন। না, তা জানবেন কি করে, সে তো কাউকে বলেনি তার মনের কথা।

যা হচ্ছে বা হয়েছে সে সব নিজে একা জানে, কাউকে সে আজও জানায়নি সে কথা।

মনিরা বললো–আমি আলীর মুখে সব শুনেছি।

আলী! আলীর মুখে সব শুনেছো? একরাশ বিস্ময় নিয়ে বললো নূর।

আলী এ বাড়ির চাকর।

অবশ্য তাকে মনিরাই এ বাড়িতে রেখেছে শুধু নূরের প্রতি যত্ন এবং খেয়াল নেবার জন্য। কখন সে ঘুমালে, কখন সে বাইরে গেলো সব লক্ষ্য করবে আলী এবং সপ্তাহ পর এ সংবাদ সঠিকভাবে পৌঁছিয়ে দেবে সে চৌধুরী বাড়িতে একটি মাত্র সন্তান মনিরার নয়নের মণি হৃদয়ের ধন। শুধু মনিরাই নয়, মরিয়ম বেগমও নূরকে জানের চেয়ে বেশি ভালবাসেন, কারণ সন্তানকে তিনি সর্বক্ষণের জন্য পাশে পাননি। তাই নাতিকে তিনি দৃষ্টির আড়াল হতে দিতে চান না।

আলীকে তাই বধূ এবং শাশুড়ি মিলে নূরের বাসায় রেখেছেন যেন সে নূরের প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখে।

নূর মায়ের কথায় অবাক হয়ে বললো–আলীর মুখে সব শুনেছে তার মানে?

আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন মরিয়ম বেগম, বললেন–শুধু আলীর মুখে শুনিনি, আমি চাক্ষুষ প্রমাণ পেয়েছি।

এসব কি বলছো তোমরা শাশুড়ি আর বউ মিলে।

যা সত্যি তাই বলছি। বললেন মরিয়ম বেগম।

নূর নির্বাক হয়ে পড়লো যেন। হঠাৎ অসময়ে মা ও দাদীমাকে তার বাসভবনে দেখে ভীষণ অবাক হয়ে গেছে, তারপর তাদের কথাবার্তা যেন হেঁয়ালিপূর্ণ লাগছে। তার মনের কথা তারা। জানলেন কি করে?

বললো নূর–বলো কি সত্যি! আমি তোমাদের কোনো কথা এখনও বুঝতে পারছি না।

বললো মনিরা–তা বুঝবে কেন, মনে করেছো আমরা কিছু জানি না। দেখো নূর, তুমি আলাদা বাসায় থাকলেও আমাদের কাছে তুমি কিছু লুকাতে পারবে না।

আম্মি!

শোন, তুমি মনে করেছে বেশ বড় হয়ে গেছো?

না আম্মি, আমি সেই কচি খোকাটিই রয়ে গেছি।

নূর, এই বয়সে এত উঁচড়ে পাকা ভাল নয়, বুঝলি? বললেন মরিয়ম বেগম।

কি করেছি বলবে তো?

বৌমা, তুমি যাও আমি সব বলছি।

মনিরা চলে গেলো পাশের ঘরে।

মরিয়ম বেগম এতক্ষণে আঁচল সরিয়ে নিয়ে বলেন– এগুলো কি?

নূর অবাক হয়ে দেখলো দাদীমার হাতে এ্যাসট্রে, তার মধ্যে পাকার অর্ধদগ্ধ সিগারেটের টুকরা।

নূর এতক্ষণে সব বুঝতে পারলো, হেসে দাদীর হাত থেকে এ্যাসট্রেটা হাতে নিয়ে টেবিলের নিচে আড়ালে লুকিয়ে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললো–বেটা আলী এইসব তোমাদের দেখিয়েছে।

বললেন মরিয়ম বেগম–ওকে আমরা রেখেছি যে কারণে সেই কারণটা তো জানাবেই।

আমি মজাটা কেমন দেখিয়ে দেবো। বারোটা ওর বাজিয়ে ছাড়বো। বললো নূর।

মরিয়ম বেগম বললেন–রাতে ঘুমাও না, সারারাত সিগারেট পান করো। নাওয়া খাওয়া ঠিকমত করোনা…

এসব আলী তোমাদের বলেছে!

বলবেই তো?

নূর যেন এতক্ষণে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো, যা হোক এই কথা। তার মনের কথা কেউ জানে না। নূর হেসে বললো–দাদীমা, তোমরা কিছু ভেবো না, আমি তোমাদের আলীর মেহেরবানিতে ঠিক মতই আছি বা থাকবো।

এবার উচ্চকণ্ঠে শিশুর মত ডাকতে থাকে নূর–আম্মি! আম্মি! এ ঘরে এসো... এতক্ষণে নূর যেন স্বাভাবিক হলো।

মনিরা এসে হাজির হলো এ ঘরে।

কিছুক্ষণ চললো নানা ধরনের কথাবার্তা। তারপর বিদায়ের পালা।

মনিরা আর মরিয়ম বেগম বারবার বললেন–আর যেন শরীরের প্রতি অনিয়ম করা না হয়। যেন ঠিকমত ঘুমানো হয়। খাবার যেন ঠান্ডা হবার পূর্বেই খাওয়া হয়।

নূর সব কথায় মাথা দোলালো, তার মনে মা আর দাদীমার কথা সব সে মেনে নিয়েছে সর্বান্তকরণে।

মা আর দাদীমাকে বিদায় দিয়েই ফিরে এলো নূর নিজের ঘরে। গম্ভীর গলায় উচ্চকণ্ঠে ডাকলো–আলী–আলী–আলী

নূরের কণ্ঠস্বরে আজ নতুন সুরের আভাস শুনতে পেয়ে আলী থরথরিয়ে কাঁপতে শুরু করলো।

পুনরায় ডাকলো নূর–আলী–আলী...

এবার আলী সম্মুখে হাজির না হয়ে পারলো না।

নূর ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললো–দাদীমা আর আম্মি হঠাৎ অসময়ে কেন এসেছিলেন?

আলী ঢোক গিলে বললো–আমি নিজেও তাই ভাবছি হঠাৎ আম্মাজান আর দাদীআম্মা কেন এসেছিলেন?

নেকামির আর জায়গা পাসনি, তাই না?

ছোট সাহেব।

বের কর ঐ এ্যাসট্রে। আংগুল দিয়ে টেবিলের নিচে দেখিয়ে দিলো নুর।

আলী কম্পিত হাতে বের করলো এ্যাসট্রেটা।

এ্যাসট্রে হাতে বেরিয়ে যাবার জন্য পা বাড়াতেই নূর বললো–কোথায় যাচ্ছিস?

পরিষ্কার করে আনতে।

এতক্ষণে এ্যাসট্রে পরিষ্কার করতে যাচ্ছিস, কেন সকাল বেলা পরিষ্কার করতে কে মানা করেছিলো?

ছোট সাহেব

বল থামলি কেন?

কোনো জবাব দেয় না আলী, ভয়মিশ্রিত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলো বারবার নূরের মুখের দিকে।

বললো নূর–এসব জমা করে আম্মি আর দাদীমাকে খবর দেওয়া হয়েছিলো? বল্ চুপ করে রইলি কেন?

ছোট সাহেব, এই বয়সে এত সিগারেট খাওয়া ভাল নয়, তাই

তাই, আম্মি আর দাদীমাকে ডেকে আনতে হবে।

মাফ করে দিন ছোট সাহেব!

যা আজ মাফ করে দিলাম, এরপর আর যদি কোনোদিন

আপনি যত খুশি সিগারেট খাবেন, বলবো না তাই তো?

কোনো কথাই আমি আর দাদীমার কানে দিবি না, বুঝলি?

কিন্তু

কি রে?

চাকরি থাকবে না।

কেন?

আম্মাজান বলেছেন কোনো কথা গোপন করলে চাকরি যাবে। সব সময় আপনার উপর নজর রাখতে বলেছেন যেন এক মুহূর্ত বেখেয়াল না হই।

ও তাই বুঝি তুই আমাকে পাহারা দিচ্ছি।

হ ছোট সাহেব।

কিন্তু আমি তোর চাকরি ছাঁটাই করবো।

ছোট সাহেব, বড় গরিব লোক আমি, চাকরিটা ছাঁটাই হলে বুড়ো মা আর ভাইবোনদের খাওয়াবো কি?

বেশ যদি চাকরি রাখতে চাস্ তাহলে আমি যা বলবো তাই করবি।

আচ্ছা ছোট সাহেব।

এখন যা, পরে সব বলে দেবো।

আচ্ছা ছোট সাহেব যাচ্ছি। চলে যায় আলী।

হাসে নূর, আম্মি আর দাদী তাকে কচি থোকা মনে করে আলীকে প্রহরী রেখেছেন। সোফায় হেলান দিয়ে একটা সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করে সে।

সম্মুখস্থ মুক্ত জানালা দিয়ে দৃষ্টি তার চলে যায় দূরে বহুদূরে সীমাহীন ঐ নীল আকাশে। খন্ড খন্ড মেঘের আনাগোনা, তারই ফাঁকে উড়ে চলেছে নাম না জানা পাখিগুলো।

নূর অন্যমনস্ক হয়ে যায়। তার চোখের সামনে ভেসে উঠে একটি মুখ। নিজ মনেই নামটা উচ্চারণ করে ফুল্লরা! ভারী সুন্দর মিষ্টি নাম।

পরদিন নিজকে সংযত রাখতে পারে না নূর, ভোরে শয্যা ত্যাগ করেই চিৎকার করে ডাকে–আলী…আলী….আলী….

আলী সবেমাত্র শয্যা ত্যাগ করে বসে বসে ঝিমুচ্ছিলো, নূরের ডাক শুনে ছুটে আসে–ছোট সাহেব আমাকে ডাকছেন।

হাঁ।

হুকুম করুন।

শোন।

বলুন ছোট সাহেব।

শিকারে যাবো।

শি–কা–রে–!

তা অমন অবাক হচ্ছিস কেন!

ছোট সাহেব, আম্মাজান আর দাদীআম্মা জানতে পারলে তা…

তোর কাঁধে মাথাটা থাকবে না।

ছোট সাহেব।

খবরদার, আর কোনো খবর যেন চৌধুরীবাড়ি না যায়।

কিন্তু

আবার কিন্তু

ছোট সাহেব তাহলে কি সত্যিই শিকারে যাবেন?

তৈরি হয়ে নে তোকে সঙ্গে যেতে হবে।

আচ্ছা! মাথাটা কাৎ করে সম্মতি জানিয়ে চলে গেলো আলী। মনটা তার উসখুস করছে সংবাদটা চৌধুরীবাড়িতে কতক্ষণে পৌঁছাবে।

কিন্তু সুযোগ হলো না আলীর তাই সে চটপট করে কাপড় জামা পরে নিয়ে এসে দাঁড়ালো ছোট সাহেবের পাশে।

গাড়ির নিকট পৌঁছে আলীকে লক্ষ্য করে বললো নূর–ড্রাইভ আসনের পাশে উঠে বস্ আলী।

আলী সুবোধ বালকের মত ড্রাইভ আসনের পাশে উঠে বসলো।

নূর বসলো ড্রাইভ আসনে।

গাড়ি ছুটলো।

আলীর মন অস্থির লাগছে, কারণ আম্মাজানের এত নিষেধ সত্ত্বেও আবার ছোট সাহেব শিকারে চললেন, না জানি কোন বিপদ সেখানে ওৎ পেতে আছে।

গাড়ির গতি ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে।

আলীর মুখচোখ বিবর্ণ হয়ে আসছে। না জানি রাইফেল নিয়ে কোথায় চলেছেন ঘোট সাহেব। বলতেও পারছে না সে কিছু, কিছু বললেই ধমক লাগাবেন ছোট সাহেব।

তবু সাহস করে বললো আলী–ছোট সাহেব, শিকারে যাবেন ফিরবেন কখন?

ড্রাইভ করতে করতে বললো নূর–শিকারে না যেতেই আগে ফিরবো কখন তোকে বলতে হবে? যখন ফিরবো তখন দেখতে পাবি।

শহর ছেড়ে নির্জন পথ ধরে গাড়ি ছুটছে।

গাড়ি যত এগুচ্ছে আলীর মুখ তত শুকাচ্ছে।

ভয় বিল চোখে সে তাকাচ্ছে নূরের মুখের দিকে।

এবার বললো নূর–আলী তোকে কেন সঙ্গে এনেছি জানিস?

তা কেমন করে জানবো ছোট সাহেব?

বলছি শোন। এখানে এলি যা দেখবি খবরদার কাউকে বলবি না।

শুধু আম্মাজান আর দাদীমা...

না, কাউকে না।

ছোট সাহেব তাহলে চাকরিটা?

আমি তোকে বেতন দেবো, আম্মি আর দাদীমাকে কিছু বলবি না। ডবল বেতন পাবি।

আচ্ছা ছোট সাহেব, এই নাক আর কান মলছি কোনো কথা তাদের বলবো না।

তাহলে চুপ করে বসে থাক।

আচ্ছা।

গাড়িখানা নির্জন পথ পেয়ে উল্কাবেগে ছুটছে!

আলী বলে উঠলো–আর কত দূর?

বললাম তো কথা বলবি না।

আচ্ছা ছোট সাহেব।

এরপর আলী একদম নীরব হয়ে গেলো।

নূর গাড়ি চালিয়ে চলেছে।

এক সময় কান্দাই জঙ্গলের ধারে এসে পৌঁছে গেলো নূরের গাড়িখানা।

গাড়ি রেখে নেমে পড়লো নূর।

আলীও নামতে যাচ্ছিলো, বললো নূর–চুপচাপ বসে থাকবি, খবরদার নামবি না।

রাইফেল হাতে তুলে নিয়ে নূর জঙ্গলে প্রবেশ করলো। দস্যু বনহুরের সন্ধান করতে এসে কান্দাই জঙ্গলে খুঁজে পেলো তার প্রিয়ার সন্ধান।

ঐ মেয়েটা কে?

কি তার পরিচয় কিছু জানে না সে। তবু কেন এত ভাল লেগেছে তার।

নূর চারদিকে দৃষ্টি রেখে এগুচ্ছে। তার চোখ দুটো সন্ধান করে ফিরছে সেই তরুণীটিকে। নুর ভাবছে তরুণীর সঙ্গে দেখা হয়েছিলো তার বেশ কয়েকদিন আগে। এরপর আর সে আসেনি, আজ হঠাৎ করে তরুণীর সন্ধান করা বাতুলতা ছাড়া কিছু নয়। সেদিন ঐ তরুণীও শিকারে এসেছিলো তাই তো হঠাৎ দেখা হয়ে গিয়েছিলো। আজ আবার তার সঙ্গে দেখা হবে এটা কল্পনাতীত...

নূর এসেছে।

হঠাৎ একটা বন্যশূকর ছুটে আসে নূরের দিকে। নূর রাইফেল উঁচু করে বন্য শূকরটাকে লক্ষ্য করে গুলী ছুড়লো।

গুলী বিদ্ধ হলো শূকরটার কাঁধে।

সে আহত হয়ে আরও ভয়ংকর হয়ে উঠলো। ভীষণ শব্দ করে আক্রমণ করলো শুকরটা নূরকে।

নূর দ্বিতীয়বার গুলী ছুড়বার পূর্বে পড়ে গেলো মাটিতে।

শুকরটা আক্রমণ করলো তাকে।

নূর দুহাতে শুকরটাকে জাপটে ধরে তাকে কাবু করার চেষ্টা করলো কিন্তু পারলো না। শূকরটার কবল থেকে রক্ষা নেই নূরের।

পেছনে পেছনে কখন যে আলীও এসে পড়েছিলো। সে ছোট সাহেবকে একটি বন্য শূকরের কবলে পড়তে দেখে চিৎকার করে উঠলো–বাচাও! ছোট সাহেবকে বাঁচাও! কে কোথায় আছো বাঁচাও....

এমন সময় একটা তীরফলক এসে বিদ্ধ হলো শূকরটার পাঁজরে।

শূকরটা এবার ঢলে পড়লো।

আলী কিন্তু চিৎকার করলেও সে আড়াল থেকে বেরিয়ে আসেনি, কারণ ছোট সাহেব তাকে গাড়ির মধ্যে বসে থাকতে বলেছে। যদি সে তাকে অবাধ্য হতে দেখেন তাহলে চাকরিটা যাবে।

আলী একটা মোটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছিলো, বেরিয়ে আসার সাহস তার হলো না। আড়াল থেকে সে দেখলো একটা মেয়ে তীর ধনু হাতে এগিয়ে আসছে।

আলীর দুচোখে বিস্ময়।

শূকরটা মাটিতে পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে নূর উঠে দাঁড়িয়েছিলো। কপাল দিয়ে রক্ত ঝরছিলো। তার কারণ শূকরটির ধারালো নখ নূরের কপালের একপাশে স্পর্শ করেছিলো। তাই কেটে গিয়েছিলো বেশ খানিকটা।

হঠাৎ ফুল্লরাকে তীর–ধনু হাতে সম্মুখে দন্ডায়মান দেখে অবাক হলো না বরং একরাশ আনন্দ ছড়িয়ে পড়লে তার ব্যথা কাতর মুখে। ক্ষতের যন্ত্রণা ভুলে গেলো নূর মুহূর্তের জন্য, বললো–ফুল্লরা, তুমি আমার জীবন রক্ষা করলে। তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

ফুল্লরা একবার নূর আরেকবার শূকরটার দিকে তাকিয়ে চলে যাচ্ছিলো। নূরের কথার কোনো জবাব না দিয়েই। নূর বললো–ফুল্লরা শোন।

থমকে দাঁড়ালো ফুল্লরা, চোখেমুখে তার ক্রুদ্ধ ভাব ফুটে উঠেছে, হয়তো বা একজন অপরিচিত ব্যক্তির মুখে নিজের নামটা শুনে তার ভীষণ রাগ হচ্ছিলো। তবু না দাঁড়িয়ে পারলো না।

নূর বললো–আমার কপাল বেয়ে রক্ত পড়ছে যদি একটু পানি দিতে, আমি কপালের রক্ত ধুয়ে ফেলতাম।

ফুল্লুরা বললো–পানি নেবে তা আমি কোথায় পাবো। এখানে তুমিও যেমন শিকারে এসেছে তেমনি আমিও শিকারে এসেছি। যাও জলাশয় খুঁজে নিয়ে....

নূর বলে উঠলো–ফুল্লরা, তোমার বাড়ি কোথায়?

সে কথা তোমার জেনে লাভ কি? যাও ওদিকে একটা জলাশয় আছে।

আমি চিনি না, যদি একটু পথ দেখিয়ে নিয়ে যাও তাহলে বড় উপকৃত হবো।

ফুল্লরা কিছুক্ষণ মৌন থেকে কি যেন ভাবলো। তারপর বললো–এসো।

ফুল্লরা চললো আগে।

পেছনে চললো নুর।

আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে আলী। তার দৃষ্টি রয়েছে ছোট সাহেবের দিকে। ছোট সাহেবের কপাল বেয়ে রক্ত ঝরছে এ দৃশ্য তার সহ্য হচ্ছিলো না তবু তাকে নিশ্চুপ থাকতে হচ্ছে। কারণ ছোট সাহেবের হুকুম গাড়িতে চুপচাপ বসে থাকা। যদি তিনি জানতে পারেন সে গাড়ি ত্যাগ করে নেমে এসেছে তাহলে চাকরিটা তার চলে যাবে।

তাই বেচারী আলী আড়াল থেকে সব দেখলেও সম্মুখে আসতে সাহসী হচ্ছিলো না। নূর যখন শুকরটির আক্রমণে ভূতলে পড়ে গিয়েছিলো তখন আলী নিশ্চুপ থাকতে পারেনি প্রাণফাটা চিৎকার করেছিলো প্রভুকে রক্ষা করার জন্য। আর সেই চিৎকার শুনেই ছুটে এসেছিলো ফুল্লরা এবং তীর নিক্ষেপ করে নূরকে বাঁচিয়ে নিয়েছিলো ভয়ঙ্কর শুকরটার কবল থেকে।

ফুল্লরা আর নূর একটি জলাশয়ের পাশে এসে দাঁড়ালো। আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো সে জলাশয়টা, তারপর বললো–যাও ওখানে তোমার কপালের রক্ত ধুয়ে নাও…কথাটা বলেই ফুল্লরা চলে যাচ্ছিলো।

নূর ডাকলো–এই শোনো।

ফুল্লরা থমকে দাঁড়িয়ে তাকালো নূরের দিকে, কি বলতে চায় নূর।

ফুল্লরাকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে নূর বললো–এসো। ফুল্লরা এসো।

ফুল্লরা এগিয়ে এলো।

নূর বললো–ফুল্লরা, আমার কপালের ক্ষমটা বড় ব্যথা করছে।

পানিতে ধুয়ে নাও।

নূর জলাশয়ের দিকে পা বাড়ালো।

এবার ফুল্লরা বললো–দাঁড়াও, আমি আঁচল ভিজিয়ে তোমার রক্ত পরিষ্কার করে দিচ্ছি। তুমি বরং এখানে বসো।

নূর এতক্ষণে স্বস্তি পেলো তার কথায়।

বসলো নূর জলাশয়ের তীরে।

ফুল্লরা আঁচল ভিজিয়ে নিয়ে এলো, তারপর আঁচলের পানি দিয়ে নূরের কপালের ক্ষতটা পরিষ্কার করে দিলো।

ফুল্লরার কোমল হাতের স্পর্শ নূরকে অপূর্ব এক আবেশে অভিভূত করে ফেললো।

নূর বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে দেখছে ফুল্লরাকে। তার জীবনে ফুল্লরা প্রথম এক স্বপ্নময় নারী হয়ে এলো।

নূরের কপালে আঁচল ছিঁড়ে পট্টি বেঁধে দিয়ে বললো–চলে যাও শিকারী, আর এ বনে এসো না।

ফুল্লরার কথাটা বড় বেদনাদায়ক মনে হলো, কারণ নূর চায় আবার আসতে এবং ফুল্লরার সান্নিধ্য লাভ করতে কিন্তু ফুল্লরার কথায় ছিলো না কোনো ভালোবাসার ছোঁয়াচ, ছিলো শুধু করুণার স্বর।

ফুল্লরা চলে যায়।

নূর ফিরে আসে তার গাড়িতে।

আলী কিন্তু গাড়িতে আগেই এসে বসেছিলো, যখন ফুল্লরাকে বিদায় জানালো তখন আলী আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে এসে বসলো গাড়ির মধ্যে।

নূর কপালে ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থায় ফিরে এলো গাড়িতে।

আলী বললো–ছোট সাহেব, আগেই বলেছিলাম জঙ্গলে বিপদ ওৎ পেতে থাকে, আপনি তবু এলেন। এখন ঐ কপাল নিয়ে কি করে ফিরে যাবেন?

আলী, বেশি কথা বলবি না। যা ভাগ্যে ছিলো তাই হয়েছে। হঠাৎ পড়ে গিয়ে কপালটা কেটে গেছে, বুঝলি?

ছোট সাহেব ডাহা মিথ্যা বলছেন, বেশ বুঝতে পারে আলী। সব সে নিজের চোখে দেখেছে। শূকরটাকে যদি ঐ মেয়েটা না হত্যা করতো তাহলে আর ফিরে যেতে হতো না ছোট সাহেবকে। ভাগ্যিস চিৎকার করেছিলো আলী।

তবে আলীর চিৎকার মনে নেই বা স্মরণে আসে না নূরের। যে মুহূর্তে আলী প্রাণফাটা চিৎকার করেছিলো সেই মুহূর্তে নূরের স্বাভাবিক সংজ্ঞা ছিলো না সে তখন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছিলো, সেই কারণেই আলীর চিৎকার তার কানে প্রবেশ করতে পারেনি।

ড্রাইভিং আসনে উঠে বসে নূর–কপালে চোট লেগেছে–খবরদার বলবিনে আম্মি আর দাদীমার কাছে, বুঝলি?

কিন্তু আম্মাজান আর দাদীআম্মা যদি সংবাদ শুনে এসে পড়েন তখন...

তখন যা বলতে হয় আমি বলবো, খবরদার তুই কোনো কথা বলবি না।

আচ্ছা ছোট সাহেব।

আচ্ছা নয়, সত্যিই চুপ থাকবি।

আচ্ছা।

নূর গাড়িতে স্টার্ট দিলো।

রাইফেলটা সে হাতে করেই এনেছিলো, সেটাকে সে রাখলো পেছন আসনের উপরে।

*

ফুল্লরা আস্তানায় প্রবেশ করে ছুটে গেলো তার মায়ের পাশে। চঞ্চল কণ্ঠে বললো–মা, জানো আজ আবার সেই বাবু এসেছিলো আমাদের বনে শিকার করতে।

কোন্ বাবু বললো নাসরিন।

দুচোখ বড় করে বললো ফুল্লরা–ঐ যে সেদিন যে বাবু হরিণ মারতে এসেছিলো। আমি আর সে একই হরিণকে শিকার করেছিলাম....

ও, এবার বুঝতে পেরেছি। কিন্তু সে বাবু কান্দাই জঙ্গলে রোজ শিকার করতে আসে কেন তা আমি কেমন করে বলবো? তবে এবার বাবু নিজেই শিকার বনে গেছে জানেনা মা, বাবুটাকে একটা বন্য শূকরে আক্রমণ করেছিলো। ভাগ্যিস আমি তীর ছুঁড়ে শূকরটাকে মারতে পেরেছিলাম, তাই বাবু জীবনে বেঁচে গেছে।

খুব ভাল করেছিস মা ফুল্লরা। একটা জীবন রক্ষা করে তুই খোদার রহমত লাভ করেছিস।

সত্যি মা?

হা সত্যি।

তবে আমি খুব ভাল কাজ করেছি...কথাটা আপন মনে বলতে বলতে চলে যায় ফুল্লরা।

পথে পড়ে যায় বনহুর।

ফুল্লরা সংকুচিত হয়ে একপাশে সরে দাঁড়ায়।

বনহুর ওকে আদর করে ফুল বলে ডাকতো, ফুল্লরা নামটা তারই দেওয়া। ফুল্লরার চেহারাটা সত্যি ফুলের মত সুন্দর কিনা তাই।

বনহুর হেসে বললো–ফুল, তোমাকে বড় খুশি খুশি লাগছে?

বললো ফুল্লরা–সর্দার, আমি একটা লোকের জীবন বাঁচিয়েছি। তাই মা বললো তোর উপর খোদার রহমত হবে।

হ ফুল্লরা, তাই হয়। আচ্ছা লোকটার কি হয়েছিলো?

ফুল্লরা সব কথা খুলে বললো।

বনহুর একটু ভাবলো, কে সে বাবু যে কান্দাই জঙ্গলে এসেছিলো শিকার করতে একদিন নয় দুদিন।

বললো ফুল্লরা–সর্দার, বাবুর চেহারাটা ঠিক তোমার মত কতকটা।

আমার মত

হাঁ, তোমার মত তার নাক চোখ মুখ

ও।

কি বুঝলে সর্দার।

আমি তাকে দেখেছিলাম তাই–চলে যায় বনহুর সেখান থেকে। ফুল্লরা যদি তাকে আরও কোনো প্রশ্ন করে বসে তাহলে জবাব দিতে পারবে না সে। ফুল্লরার কথায় সে বুঝতে পেরেছে সেই বাবু অন্য কেউ নয়, তারই ছেলে প্রখ্যাত ডিটেকটিভ নূরুজ্জামান চৌধুরী নূর। ভাগ্যিস ফুল্লরা সেদিন বন্দীকে দেখেনি তাই রক্ষা, নাহলে নূরকে আবার সে বন্দী করে নিয়ে আসতে আস্তানায়। তবে জাভেদের নজরে যদি পড়ে যায় তাহলে মুস্কিল হবে–একটা গভীর চিন্তার ছাপ ফুটে উঠে বনহুরের মুখমন্ডলে।

বনহুর তার ড্রেসিং গুহায় প্রবেশ করে জমকালো পোশাক পরে নিলো। পিস্তল ভরে নিলো প্যান্টের পকেটে।

এমন সময় নূরী এসে দাঁড়ালো বনহুরের সম্মুখে। দুচোখে বিস্ময় নিয়ে বললো–চমৎকার অপূর্ব

তার মানে?

ভারী সুন্দর লাগছে তোমাকে।

এ কথা কতবার শুনেছি তোমার মুখে।

শুধু আমার মুখেই নয়, বহু নারীর মুখে তুমি এ কথা শুনেছো।

অস্বীকার করছি না, বলো তারপর?

তারপর কোথায় চললে শুনি?

কান্দাই শহরে।

কেন? আবার কি দস্যুতার জন্য ডাক এসেছে?

না।

তবে?

চৌধুরীবাড়িতে যাবো।

এ ড্রেসে না গেলেই কি নয়?

তাহলে কোন্ ড্রেসে যাবো বলো?

স্বাভাবিক নাগরিক বেশে যাও সন্তানের কাছে।

নূরী।

হা হুর, নূর কিন্তু তার পিতার জন্য অস্থির রয়েছে। কতদিন তার মা সন্তানকে মিথ্যা প্রবোধ দিয়ে রাখতে পারে বলো? আমি জানি মনিরা আপা তার সন্তানকে জানিয়ে দিয়েছে তুমি আফ্রিকার কোনো এক জায়গায় থাকো। সেখানে তোমার দায়িত্বপূর্ণ চাকরি, যার জন্য দেশে আসতে পারো না।

এসব তুমি কেমন করে জানলে নূরী?

তোমার অবর্তমানে আমি তার বাসায় গিয়েছিলাম।

বলো কি নূরী!

হাঁ।

কেমনভাবে গেলে?

শুনবে?

শুনতে ইচ্ছা করছে, কারণ তুমি যখন এত কথা জেনে নিয়েছে, আমারও জানা দরকার।

তবে শোনো, আমি একদিন চুড়িওয়ালীর বেশে শহরে যাই এবং একেবারে চৌধুরী বাড়িতে গিয়ে হাজির হই।

তারপর?

দরজায় বাধা পাই, পাহারাদার কিছুতেই ভিতরে আমাকে প্রবেশ করতে দিচ্ছিলো না। আমি পাহারাদারকে হাত করে নিয়ে ভিতরে যাই। প্রথমেই আসেন তোমার মা, তিনি আমাকে বললেন, চুড়ি আমরা পরি না মা, তুমি যেতে পারো। আমি কিন্তু নাছোড়বান্দা, চুড়ি তাঁকে নিতেই হবে। নতুন ধরনের চুড়ি এনেছি... শুনে বললেন তিনি,–দেখি বৌমাকে পাঠিয়ে দেই।

তারপর?

তোমার মা উপরে চলে গেলেন, একটু পরে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন তোমার আদরিণী মনিরা আপা।

এবার নিশ্চয়ই সে তোমাকে চিনে ফেললো?

মোটেই না।

তাহলে....

আমাকে দেখে বললো সে–কেমন চুড়ি আছে দেখাও দেখি।

আমি মনিরা আপার হাতখানা টেনে নিয়ে দেখলাম, তারপর নতুন ধরনের চুড়ি বের করে পরিয়ে দিলাম। ভারী সুন্দর মানিয়ে ছিলো ওকে! বললেন–তোমার চুড়িগুলো সত্যি প্রশংসনীয়। আমি বললাম–আপনার স্বামী খুব খুশি হবেন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললো মনিরা আপা–সে বহু দূরে আছে।

তারপর আমি তাকে ধরে বসলাম। তখন সে আমাকে যে কথা জানালো তাতে বেশ বুঝতে পারলাম। মনিরা তার সন্তান নূরকেও জানিয়েছে তার আব্বু আফ্রিকার কোনো এক স্থানে কাজ করেন–বাস সব জানা হয়ে গেলো।

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বললো—হু।

নূরী বললো– করলেই চলবে না, তোমাকে স্বাভাবিকবেশে চৌধুরীবাড়িতে যেতে হবে।

বনহুর মেনে নিলো নূরীর কথাগুলো।

*

আহত অবস্থায় ফিরে এলো নূর।

শিকারে গিয়ে বন্য শূকরের পাল্লায় পড়ে জখম হয়েছে কথাটা প্রকাশ পেতে বিলম্ব হলো না।

মরিয়ম বেগম আর মনিরা এসে হাজির হলেন।

তারা তো নূরকে নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

ডাক্তার এলো।

চিকিৎসা চললো পুরোপুরি।

নূর কিন্তু মোটেই কাবু হয়নি।

সে বিপুল সাহস নিয়ে বললো–আমার তেমন কিছু হয়নি, দুদিনেই সেরে যাবে।

মিঃ শংকর রাও নিজে এসেছিলেন নূরুজ্জামান চৌধুরীকে দেখতে, এসে সহানুভূতি জানালেন, তারপর বিদায় গ্রহণ করলেন।

গাড়ি নিচে অপেক্ষা করছিলো।

মিঃ শংকর রাও গাড়িতে গিয়ে বসলেন।

কিছুটা পথ চলার পর মিঃ শংকর রাও চমকে উঠলেন, কারণ তাঁকে অন্যপথে আনা হয়েছে। অন্যমনস্ক থাকার জন্য তিনি বুঝতে পারেননি।

মিঃ শংকর রাও বললেন–ড্রাইভার, এ কোন পথে নিয়ে এলে?

মুখ ফিরিয়ে তাকালো ড্রাইভার, বললো ঠিক পথেই আনা হয়েছে।

মিঃ শংকর রাও বিস্ময়ে শব্দ করে উঠলেন–দস্যু বনহুর।

হাঁ বন্ধু, আমি।

কিন্তু....

আপনাকে কদিন আমার আস্তানার নির্জন কক্ষে বিশ্রাম করতে হবে।

মিঃ শংকর রাও ভাবতেও পারেননি তার গাড়ির ডাইভ আসনে স্বয়ং দস্যু বনহুর। চারদিকে। তাকিয়ে দেখলেন এ পথে লোকজন বা যানবাহন নেই। গাড়িখানা দাঁড়িয়ে পড়তেই ড্রাইভিং আসন থেকে নেমে দাঁড়ালো বনহুর, তার ডান হাতে রিভলভার।

মিঃ শংকর রাওয়ের পকেটেও রিভলভার ছিলো কিন্তু তা বের করার সুযোগ পেলেন না। অসহায় বালকের মত নেমে পড়তে বাধ্য হলেন।

বনহুর মিঃ শংকর রাওকে বললো–বিনা বাক্যে আমার সঙ্গে এগিয়ে চলুন।

তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে যেতে চাও?

আমার আস্তানায়।

কেন?

কদিন বিশ্রাম করবেন।

বনহুর!

আমিই যে বনহুর তা আপনার চিনতে কষ্ট হয়নি দেখছি। একটু থেমে বললো বনহুর–কান্দাই শহরে পুলিশমহলে। এখন একটিমাত্র ব্যক্তিই আছেন যিনি আমাকে চেনেন–তিনি হলেন আপনি।

তাই তুমি আমাকে আটক করে লুটতরাজ হত্যালীলা চালাতে চাও?

না।

তবে?

আমি আমার সন্তান নূরের পাশে পিতার বেশে হাজির হতে চাই। জানি এ কথা আপনি জানলেও আমার সন্তান নূরকে কোনোদিন বলতে পারবেন না, কারণ সন্তানকে দিয়েই আপনি স্বার্থসিদ্ধ করতে চান। আমাকে বন্দী করতে চান নূরের সাহায্যে….

এত কথা তুমি জানলে কি করে?

পুলিশমহলের এমন কোনো কথা নেই যা আমি জানি না। চলুন এবার তবে চোখ দুটো আমি বেঁধে দেবো, কোনো আপত্তি চলবে না।

মিঃ শংকর রাও কোনো আপত্তি করতে পারলেন না, কারণ দস্যু বনহুরের কাজে বাধা দেবার মত শক্তি ছিলো না তার।

*

হঠাৎ একটা টেলিগ্রাম এসে হাজির নুরের নামে। তার পিতা মনিরুজ্জামান চৌধুরী দেশে আসছেন।

আনন্দে আত্মহারা হলো নূর।

ভুলে গেলো সে নিজের অসুস্থ অবস্থা।

মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থায় গাড়ি নিয়ে ছুটলো সে চৌধুরীবাড়িতে।

টেলিগ্রাম দেখালো নূর মা আর দাদীমাকে।

মনিরার মুখে কোনো কথা বের হলো না।

মরিয়ম বেগম আনন্দ ভরা কণ্ঠে বললেন–এতদিন পর মা, সন্তান এদের কথা মনে পড়েছে তাহলে।

দাদী আম্মু, তুমি যাবে না আব্বুকে বিমান বন্দর থেকে এগিয়ে আনতে?

নূরের কথায় বললেন মরিয়ম বেগম–তুমি আর সরকার সাহেব যেও তাহলেই চলবে।

আম্মি, তুমিও কি যাবে না?

না।

কেন?

যার কোনোদিন স্ত্রী–পুত্র–মার কথা মনে পড়ে না তার আগমনে আমি মোটেই সন্তুষ্ট নই।

আম্মি, এ কথা আব্বু, শুনলে ব্যথা পাবে।

আর আমাদের বুকে কত ব্যথা জমা হয়ে আছে তার খোঁজ কোনোদিন সে নিয়েছে? যাক তুমি আর সরকার সাহেব গেলেই চলবে।

নুর আর সরকার সাহেব বিমান বন্দরে গেলেন এবং বিমান বন্দর থেকে চৌধুরী মনিরুজ্জামানকে অভ্যর্থনা জানিয়ে নিয়ে এলেন বাড়িতে।

সরকার সাহেব আনন্দ অশ্রু বিসর্জন করে বললেন–এতদিন পর এলে মনির?

হেসে বললো বনহুর–আপনি তো জানেন সরকার চাচা, ইচ্ছে করলেই আসা যায় না।

নূর তো আনন্দে আত্মহারা কতদিন পর সে পিতাকে ফিরে পেয়েছে। প্রাণভরে সে পিতাকে দেখছে! অপূর্ব পৌরুষদীপ্ত একটি মুখ, যে মুখের সঙ্গে তুলনা হয় না আর কোনো মানুষের!

নূর আজ ছোট্টটি নয়, সে অনেক বড়। একজন প্রখ্যাত ডিটেকটিভ। শিশুর মত পিতার কোলে গিয়ে বসতে না পারলেও একেবারে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলো।

বনহুর নূরকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলো।

কারণ এমন করে দেখবার সুযোগ তার হয়নি অনেকদিন।

এক সময় বললো নূর–আব্বু, আমাদের স্নেহ মায়া মমতার চেয়ে তোমার কাছে টাকাটাই বড়?

হঠাৎ নূরের এ প্রশ্নে বনহুর একটু বিব্রত হলো, তবু সে চট করে নিজকে সামলে নিয়ে বললো–নূর, তুমি কি মনে করো আমি শুধু টাকার জন্য তোমাদের থেকে দূরে রয়েছি।

হাঁ, আমার তাই মনে হয়।

বলো আব্বু?

টাকা বা ঐ ধরনের কোনো বস্তুর জন্য আমি দূরে থাকি না। যেখানে থাকি সেখানে আমার সাধনার সামগ্রী রয়েছে। নূর আমি থাক সে সব কথা। এবার বলো তোমার খবর

বললো নূর–আব্বু, আমার খবর বলবো, কারণ জানি তুমিই পারবে আমাকে বুদ্ধি বাতলে দিতে। তার পূর্বে বলো এবার আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে?

কোথায়? চোখ দুটো তুলে ধরলো বনহুর পুত্রের মুখের দিকে।

বললো নূর–তুমি যেখানে থাকো। সেই আফ্রিকার কোনো অজানা স্থানে

বেশ, যেতে চাও নিয়ে যাবো। এখন তো ছোট্টটি নও, বড় হয়েছে, কোনো অসুবিধা হবে না।

নূর ছোট বালকের মত আনন্দসূচক শব্দ করে উঠলো–সত্যি আব্বু তুমি আমাকে নিয়ে যাবে

হাঁ।

ছুটলো নূর আম্মির ঘরে।

ঘরে গিয়ে দেখলো আম্মি নেই। এলো বারান্দায়। সেখানেও নেই মনিরা। এবার নূর ডাকাডাকি শুরু করে দিলো–আম্মি, আম্মি তুমি কোথায়?

হঠাৎ নূরের দৃষ্টি চলে গেলো দোতলার বেলকুনিতে। ওদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে মনিরা।

নূর আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে হাজির হলো মায়ের পেছনে, আলগোছে টিপে ধরলো মায়ের চোখ দুটো।

মনিরা পুত্রের হাতের উপর হাত রেখে বললো–এখানে কি করতে এলি নূর?

আব্বু কতদিন পর এসেছেন আর তুমি এখানে...জানো আম্মি, আব্বু কথা দিয়েছেন এবার আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

কোথায়?

যে দেশে তিনি থাকেন সেই আফ্রিকার জঙ্গলে

জঙ্গলে?

ধরো তাই।

নূর আমি তোকে যেতে দেবো না।

হো হো করে হেসে উঠলো নূর–তুমি কচি খুকীর মত কথা বললে আম্মি। আমি এখন অনেক বড়, একাই চলে আসতে পারবো।

কি হচ্ছে, মা ছেলে মিলে কিসের গল্প হচ্ছে শুনি? বনহুর আপনা আপনি মনিরার আর নূরের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

মনিরা গম্ভীর কণ্ঠে বললো–তুমি সবার মায়া বিসর্জন দিয়েছে, আবার নূরকে কেন টানছে বলো তো?

নূর বলে উঠলো–আব্বু মোটেই টানছেন না, আমিই তাকে ধরে বসেছি এবার আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।

বনহুর আর মনিরার মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হলো।

নূর হেসে বললো–কারও বাধাই আমি শুনবো না। এবার আমি যাবোই, দেখতে চাই আব্বু ওখানে তোমার কি কাজ।

নূরের কণ্ঠস্বর গম্ভীর স্থির অটল।

*

একদিন দুদিন তিন দিন কেটে গেলো।

বললো বনহুর আমার যাবার দিন এগিয়ে আসছে।

মনিরা স্বামীর বুকে মাথা রেখে বললো–আর কতদিন তুমি সন্তানের কাছে ফাঁকি দিয়ে বেড়াবে?.এবার নূর তোমার সঙ্গে যাবে বলেছে, ওকে তুমি কোথায় নিয়ে যাবে।

আফ্রিকায়।

কিন্তু

সব ঠিক হয়ে গেছে।

তার মানে?

কায়েস কাল বন্ধুর বেশে এসেছিলো, আমি তার কাছে সব লিখে জানিয়ে দিয়েছি।

তুমি সেখানে মস্ত বড় কি করো, এ কথাই জানে নূর।

সে ব্যবস্থা আমি করেছি মনিরা।

কিন্তু সে ডিটেকটিভ এবং তোমারই ছেলে, বুঝতেই পারছো তার কাছে সব ফাঁস হয়ে যেতে পারে।

তুমি কিছু ভেবো না মনিরা, সব ঠিক হয়ে যাবে। শোনো নূরের কপালের ক্ষতটা আমাকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছে, কারণ আজও পর্যন্ত তার ক্ষতটা শুকায়নি। আমি কাল ডাক্তারের পাশে বসে সব দেখেছি।

হাঁ আমি নিজেও এ ব্যাপারে বেশ চিন্তিত আছি। আচ্ছা একটা কথার সঠিক জবাব দেবে?

নিশ্চয়ই দেবো। আর কবেই বা তুমি আমার কাছে সঠিক জবাব পাওনি?

আচ্ছা তুমি নূরকে কেন তোমার আস্তানায় আটক করেছিলে জবাব দাও?

আমি তাকে আটক করিনি!

মিথ্যে কথা।

তুমি বিশ্বাস করো আমি নূরকে আটক করিনি।

তবে কে তাকে আটক করেছিলো।

জাভেদ।

জাভেদ, সেই শয়তানী মেয়েটার ছেলে?

মনিরা।

জানি তুমি…

মনিরা তুমি সব জানো, জেনেও এ ধরনের উক্তি তোমার করা উচিত নয়।

ঐ শয়তানী আমার স্বামীকে হরণ করেছে আমার জীবনকে অশান্তিময় করে দিয়েছে।

মনিরা যদি সে বলে তুমি তার স্বামীকে…

না, তুমি আমার স্বামী! চিরদিন আমার থাকবে। তুমি কোনোদিন অপরের হতে পারো না। আমি তা সহ্য করতে পারবো না। শোনো এর পর যদি নূরকে জাভেদ কোনো রকম আঘাত করে তাহলে আমি তাকে ক্ষমা করবো না। পুলিশকে সব কথা জানিয়ে দেবো।

মনিরা, তুমি কেন আজও নূরীকে মেনে নিতে পারছে না। কেন তুমি তার নাম শুনলে রেগে। উঠো। জানো মনিরা নূরী তোমায় কত ভালবাসে।

আমি তার ভালবাসার জন্য লালায়িত নই।

তবু সে তোমাকে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে। তোমার সন্তান নূরকে জীবনের চেয়েও এমন কি তার নিজের সন্তানের চেয়েও বেশি স্নেহ করে। মনিরা, তোমার নূরকে জাভেদ বন্দী করে নিয়ে গেলেও এতটুকু অযত্ন তার হয়নি।

সব আমি নূরের মুখে শুনেছি। একটু থেমে বলালো মনিরা–তোমার সেই নূরী আমার নূরকে যাদু করেছে। সে তার কথা ভুলতে পারেনি। সব সময় আমাকে তার কথা বলে।

মনিরা, এটা তার মহত্ব…

না, আমি মানি না।

মনিরা, মনকে বড় করো।

তুমি কি মনে করো আমার মন…

বনহুর মনিরার মুখে হাতচাপা দেয়–না, আমি জানি তুমি সীমাহীন ধৈর্যশীলা নারী। মনিরা, তোমার প্রেরণা, ভালবাসা না পেলে আমি নিঃস্ব হয়ে যেতাম। গভীর আবেগে বনহুর মনিরাকে টেনে নেয় বুকে।

*

আফ্রিকা তোমার কাছে কেমন লাগছে নূর! বললো বনহুর।

নূর খেতে খেতে জবাব দিলো–বড় সুন্দর। সবচেয়ে সুন্দর তোমার বাড়িখানা। সত্যি আব্বু, এর পূর্বে এমন সুন্দর বাড়ি আমার নজরে পড়েনি। পাহাড়ের উপরে

বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি অপূর্ব। বারান্দায় দাঁড়ালে দৃষ্টি চলে যায় দূরে অনেক দূরে। লন্ডনেও আমি এত সুন্দর বাড়ি দেখিনি। আব্বু, তুমি এতদিন কেন গোপন করেছে পৃথিবীর অদ্ভুত অদ্ভুত বৃক্ষ নিয়ে তুমি গবেষণা করছো? কেন সবাইকে বলেছো তুমি এক দায়িত্বপূর্ণ বড় চাকরি করো?

এ আর এমন কি! অহেতুক খেয়াল ছাড়া কিছু নয়। তা ছাড়া তোমার মা এ সব শুনলে ভীষণ রাগ করবেন, তাই...

তাই তুমি বছরের পর বছর আত্মগোপন করে আফ্রিকার জঙ্গলে গাছপালা নিয়ে গবেষণা চালাবে, এতে তোমার লাভ কি আব্বু?

পরে একদিন সব জানবে নূর।

এখনও কি তুমি মনে করো আমি ছোটই আছি, আব্বু, তোমার সাধনা এবার দেশে চালাতে হবে।

তা কি হয়, এত গাছপালা দেশে পাবো কোথায়?

কেন, দেশে কি গাছপালার অভাব?

আফ্রিকার জঙ্গলে আমি হাজার হাজার বছর আগের গাছের সন্ধান পেয়েছি, আর আমাদের দেশে

বুঝেছি তোমার সাধনা দেশে চলবে না। তোমার সাধনা আফ্রিকার জঙ্গল।

হাসলো বনহুর।

আব্বু।

বলো?

আম্মিকে চিরদিন এভাবে দূরে রেখে তুমি শান্তি পাও?

সাধনা বড় কঠিন জিনিস নূর। যাক ওসব কথা, বল আজ কোন্ দিকে যাবে?

এই এক সপ্তাহ বহু জায়গা, বহু জঙ্গল, বহু জীবজন্তু দেখলাম, এবার ফিরে যাবো ভাবছি।

আর কটা দিন থেকে যাওনা নূর।

আব্বু, তোমাকে ছেড়ে তোমার এই সুন্দর বাংলো ছেড়ে মোটেই যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না, তবু যেতে হবে।

কেন, এত তাড়া কিসের?

তোমার যেমন সাধনা বৃক্ষ নিয়ে, তেমনি আমার সাধনা দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করা

মৃদু হাসলো বনহুর।

নূর বললো–আব্বু, আমি কালকেই রওনা দেবো।

আমাকে যেতে হবে তোমার সঙ্গে?

না আব্বু, আমি একাই যেতে পারবো।

জানি পারবে। লন্ডন থেকে তুমি একাই তো এসেছো। কাজেই কোনো অসুবিধা হবে না। পৌঁছে সংবাদ পাঠাবে। মায়ের দিকে সব সময় নজর দিও।

আচ্ছা আব্বু।

নূরকে বিমান বন্দরে বিমানে তুলে দিয়ে ফিরে এলো বনহুর তার বাংলোয়। সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলো উপরে, তারপর চাবি দিয়ে একটা দরজা খুলে ফেললো। ঐ কক্ষে লিফট ছিলো। বনহুর লিফটে চেপে নেমে গেলো নীচে।

একটা সুন্দর কক্ষ।

বনহুর কক্ষের ভিতরে প্রবেশ করতেই এক বৃদ্ধ তার সম্মুখে এগিয়ে এলেন। মাথায় শুভ্র একরাশ চুল, মুখে একমুখী লম্বা দাড়ি, ঐ জোড়াও সাদা ধবৃধবে চোখ দুটো আজও ঘোলাটে হয়ে যায়নি। তেজোদ্দীপ্ত দৃষ্টিমুখে হাসির আভাস।

বনহুর হাত বাড়িয়ে দিলো।

বৃদ্ধ করমর্দন করলেন।

বনহুর বললো–অশেষ ধন্যবাদ মিঃ হ্যারিসন লর্ড। আপনার গবেষণাগার এবং বাংলো আমাকে এক সপ্তাহের জন্য ছেড়ে দিয়ে আপনি আমাকে কৃতার্থ করেছেন। চিরদিন স্মরণ থাকবে আপনার কথা।

মিঃ লর্ডের মুখে দীপ্তিময় হাসি।

বনহুর বললো–এবার কান্দাই ফিরে যেতে হবে। সেখানে আমার শহরের আস্তানায় আটক আছেন মিঃ শংকর রাও। এবার তাকে মুক্তি দিতে হবে।

বেরিয়ে যায় বনহুর সেই কক্ষ থেকে।

আবার সেই বিমান বন্দর।

গাড়ি থেকে নামলো বনহুর বিমান বন্দরে। এখন তাকে দেখলে চিনবার যো নেই, কারণ বনহুর এখন এক কাবুলিওয়ালা।

মুখে দাড়ি।

চোখে কালো চশমা।

ঢিলা পাজামা আর পাঞ্জাবী পরা, হাতে দামী ঘড়ি।

বনহুর বিমান বন্দরে নেমে দাঁড়াতেই তার মনে পড়লো কয়েক ঘন্টা পূর্বে নূরকে সে বিমানে তুলে দিয়ে গেছে। তাকেও যেতে হচ্ছে একই স্থানে কিন্তু পৃথক বিমানে।

বিমান দাঁড়িয়ে আছে। বনহুর অন্যান্যের সঙ্গে বিমানের দিকে পা বাড়ায়। একবার তাকায় সে বহুদূরে পাহাড়ের দিকে, যেখানে মিঃ লর্ড সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে গবেষণা চালিয়ে এসেছেন।

বনহুর অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলো।

তাড়াতাড়ি বিমানে চেপে বসলো এবার সে। অন্যান্য যাত্রী নিজ নিজ আসনে বসে পড়লেন।

বিমান এখন আকাশে উড়বার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, ঠিক ঐ মুহূর্তে বিমানের দরজা খুলে প্রবেশ করলেন আফ্রিকার পুলিশ প্রধান, বললেন, বিমান উড়বে না– বিমানটিকে পুলিশবাহিনী ঘেরাও করে ফেলেছে। এই বিমানে দস্যু বনহুর আছে জানা গেছে

সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীদের মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠলো।

[পরবর্তী বই মহাচক্র]

পূর্ববর্তী:

« ৬.১৪ দস্যু বনহুর ও মিস লুনা

পরবর্তী:

৭.০২ মহাচক্র »